প্রথম প্রকাশ : আগষ্ট—১৯৫৮

প্রকাশিকা : শ্রীমতী বিজন সেন

মুদ্রাকর :— রবীন্দ্রনাথ সিংহ
পাবলিসিটি প্রিণ্টার্স
৪৫, রাজা রামমোহন সরণী। কলিকাতা-৯

পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারার চিরাচরিত পথে না গিয়ে লেখক কল্যাণসুন্দরম্ বস্তুবাদী দর্শনের ভিত্তিতে এই বইটি প্রস্তুত করেছেন। লেখকের সঙ্গে সবাই একমত হবেন এমন আশা হয়তো তিনি করেন না। কিন্তু তাঁর দেখবার ভঙ্গিতে যে ইতিহাসবোধ ও জীবনবোধ ফুটে উঠেছে তা নিয়ে কোনো দ্বিমতের অবকাশ নেই। সাহিত্য সামাজিক মানুষের সৃষ্টি। তার সঙ্গে মিশে আছে তাঁর অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা। সাহিত্য কোনো নিরাবলম্ব বিষয় নয়। একজন লেখক সমাজেরই একজন। এই সমাজ বস্তুটার আসল চেহারাটা কি তা জানতে না পারলে সমাজসত্য একজন লেখকের কাছে ধরা পড়ে না। শিল্প এমন একটি প্রকরণ যার সাহায্যে লেখক বাস্তবকে পরিমাপ করে তাকে রূপায়িত করে। এই প্রক্রিয়া সহজ নয়, বিস্তর অনুশীলন নির্ভর। সে কারণেই সাহিত্য বিচারে গুণাগুণের তারতম্য বিশ্লেষণের প্রশ্ন থাকে।

বর্তমান লেখক একজন পাঠক হিসেবে সাহিত্যকে যেমন বিশ্লেষণ করেছেন তেমনি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা নিয়ে সমাজ বিবর্তনের ধারার সঙ্গে সাহিত্য সৃষ্টিকে মিলিয়ে দেখেছেন। সাহিত্য সৌন্দর্যবোধেরই একটা প্রকাশ। মানুষের এই সৌন্দর্যানুভূতিও সমগ্র শ্রমের ইতিহাসের ফল। কান তো সব জন্তুরই আছে, কিন্তু মানুষেরই আছে গান শোনার মতো কান। পাখিও বাসা তৈরি করে। কিন্তু সে শুধু নিজের জন্য। মানুষই শুধু নিজের প্রয়োজন ছাড়াও শুধু শিল্পনিদর্শন হিসেবে গড়ে তুলতে পারে অসামান্য স্থাপত্যকর্ম। সাহিত্যও তার এমনি একটি কাজ যার দ্বারা মানুষ সমাজের মুখ দেখে এবং দেখায়। তার মধ্যে কল্পনা যা আছে তাও সত্যমূলক। এই সাহিত্যকে নিছক খেয়াল কিংবা সমাজ-নিরপেক্ষ কোনো শিল্পকর্ম যারা মনে করেন তাদের যুক্তি লেখক খুব বিনয়ের সঙ্গে কিন্তু আত্মবিশ্বাসে প্রাণিত হয়ে খণ্ডন করেছেন। বইয়ের প্রতিপাদ্যই হল বাংলা প্রগতি সাহিত্যের নিরিখে ইতিহাস বিচার। পূর্বসূরীদের রচনার ধারাবাহিকতা অনুসারে তিনি বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন যুগ থেকে উদাহরণ উৎকলন করে বস্তুবাদী বিশ্লেষণ পরিবেশন করেছেন। চর্যার যুগ থেকে তাঁর এই পরিক্রমণ। আধুনিক কালে এসে তার পরিসমাপ্তি। স্বল্পপরিসরে তাঁকে বিস্তৃত ভুবন প্রদক্ষিণের পরিচয় দিতে হয়েছে। ফলত, পাঠকের কাছে হয়তো কোথাও কোথাও আলোচনাগুলি সূত্রাকারে উপস্থিত করা হয়েছে বলে

মনে হবে। কিন্তু গ্রন্থকার যে মনোযোগ দিয়ে বাংলা সাহিত্যের প্রধান লেখকদের কবিতা উপন্যাস ও ছোট গল্পের বস্তুবাদী বিশ্লেষণ করেছেন তার পরিচয় এতে নিশ্চিতভাবেই পাওয়া যায়। আমি তাঁকে সমালোচক না বলে বরং একজন পরিশ্রমী পাঠক হিসেবেই বিচার করতে বলব। তিনি ক্ষুরধার পথে সাহিত্য পরিক্রমা করেছেন। পরিষ্কার ভাষায় বলতে হয়, সমালোচনার জগতে ভাববাদী কুয়াশা ঠেলে এগোতে চেয়েছেন তিনি। সাহিত্য ও সাহিত্যিকের সামাজিক দায়টা কী এবং কোথায় তা তিনি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করে দেখিয়েছেন। এ হল দেখার চোখ ও বিচারের মনোভঙ্গি। এই দুইয়ের সমাহারে তৈরি হয়েছে এই গ্রন্থ।

আমি এর ভূমিকা লেখকের দায়িত্ব নিয়েছি শুধু একজন নবীন লেখকের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাবার জন্য। তাঁর বিচার যে-পথে গেছে তা শিল্পের সামাজিক দায়বদ্ধতায় চিহ্নিত। বাংলা সাহিত্যে এই ধারার সমালোচনা এখনো প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায় না। সুতরাং এটাও একটা সংগ্রাম। অবশ্যই কোনো নিয়মনীতি যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করে শিল্প-বিচার করলে তাতে ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে। এ সম্পর্কে বর্তমান লেখক যথেষ্ট সজাগ। তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে পূর্বসূরীদের রচনা বিচার করেছেন। আমাদের সামনে সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে উন্মোচিত হয় একটি দর্শন ও একটি মানবিক মূল্যবোধের দলিল। বস্তুত সাহিত্য মানুষের জীবন-যাপনের সংগ্রামেরই শিল্পিত রূপ। তাকে জানতে হলে মানব সমাজের সংগ্রামের ইতিহাসকেও আমাদের জানতে হবে। এই গ্রন্থের লেখক বড় সুন্দর করে সেই ইতিহাসের পর্বগুলি বিশ্লেষণ করে সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা পাঠকদের সানুরাগ মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারলেই শ্রম হবে সার্থক।

কৃষ্ণ ধর

প্রগতি সাহিত্য ও প্রগতির সাহিত্য

মানুষকেই সবকিছুর মাপক বলা হয়। সুকুমার কলা প্রসঙ্গে মাপকরূপে মানুষের ভূমিকা একটু বেশী। মানুষ তার সৃষ্টিকে—শিল্প, সাহিত্য কিংবা সংগীতকে সামাজিক মানুষের বিকাশে এবং বিকাশের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারছে কি না, তার দ্বারাই বিবেচিত হবে সাহিত্যের সার্থকতা। মানুষ তাই, আমাদের আলোচনায় চিরায়ত, স্থায়ী এবং অপরিহার্য মানদণ্ড রূপে বিবেচিত হবে।

প্রগতি সাহিত্য আর প্রগতির সাহিত্য সমার্থক নয়। বাস্তব সাহিত্যের সঙ্গে বস্তুবাদী সাহিত্যের গুণগত তফাৎ দূরতিক্রম্য। সংজ্ঞা দানের শর্ত অবশ্যমান্য। সংজ্ঞা দিলে অংশীভূত হয় বস্তু মাত্রেই। সাহিত্য বা সুকুমার কলাকে গণ্ডীবদ্ধ করা হলেও, সংজ্ঞা দানের প্রয়োজনেও, গণ্ডীবদ্ধ হলেই সাহিত্য গণ্ডীমুক্ত সর্বজনীন রূপ লাভ করে। মাপক শব্দ কিংবা শব্দসমূহ বিষয়কে করে অর্থবোধক এবং গতিময়। এই গতিই সর্বজনীনতার উৎস রূপে বিবেচিত হয়।

প্রগতিকে অগ্রতির [প্রোগ্রেসন Progresssion] সমার্থক এবং নিয়ত বিকাশমান—অর্থ, ব্যঞ্জনা এবং স্পর্ধায়, মনে করা যেতে পারে। মানুষ যেহেতু মাপক, তাই, মরুভূমির বিকাশ মানব প্রগতি নয়। কিন্তু বন সৃজন প্রগতির সহায়ক।

সুতরাং সকল অগ্রগতিই প্রগতি নয়। সাহিত্য যখন মানব-মুক্তির কথা বলে, তখনই তা প্রগতি-সাহিত্য। প্রগতি সাহিত্য অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবে শ্রেণীহীন সমাজ বিকাশে। বেদনাহীন সমাজই হবে তার লক্ষ্য। কেননা, শ্রেণীহীন সমাজেই বেদনাহীন সমাজ ব্যবস্থা স্থায়ী হতে পারে। এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারে বস্তুবাদে বিশ্বাসী সাহিত্যিক এবং তার সাহিত্য। মনে রাখতে হবে, সাহিত্য 'বাস্তব' হলেই তা প্রগতি আনবে না। শিল্পী-মানসে সমাজ চেতনা এবং জীবনের কাছেও প্রতিশ্রুতি থাকতে হবে। আর সেই জীবন হবে সমাজ-বদ্ধ মানুষের জীবন। এই চেতনা স্বয়ম্ভু নয়। কেননা, এই

চিন্তা-চেতনা, শতাব্দী অতিক্রান্ত চিন্তা, যুক্তি ও ব্যাখ্যার প্রতিক্রিয়া। অতএব, সেই দীর্ঘ অনুশীলনজাত তত্ত্বের সাঙ্গীকরণ হলেই আসবে পূর্ব উল্লিখিত এই চেতনা। এই চেতনা-সমৃদ্ধ মন সৃষ্টি করবে বস্তুবাদী বাস্তব সাহিত্য। একেই আমরা বলছি প্রগতি সাহিত্য। আর এই চিন্তার প্রতিফলন যখন লেখকের অজ্ঞাতসারে ঘটে, কিংবা জ্ঞাতসারে কিন্তু দায়বদ্ধ না-থেকে, তখন তা হবে প্রগতির সাহিত্য।

কেন বাস্তব সাহিত্যের সঙ্গে বস্তুবাদী সাহিত্যের এই পৃথকীকরণ? পৃথক এরা কেননা, যে-কোন সত্য কাহিনীর সাহিত্য-রূপ বা প্রতিফলনই বাস্তব। এরকম প্রতিফলন সাহিত্যে ঘটে। আর তখন তাকে বাস্তব সাহিত্য বলতেই হয়। অনেক মানুষই অশালীন আচরণ করছে। হত্যা অথবা পাশবিকতা এই সমাজে ঘটছে। সাহিত্যে তার প্রতিফলনও হচ্ছে। সভ্যতা বহতা। পূর্ব পুরুষেব চিন্তা-চেতনার উত্তরাধিকারী বর্তমান প্রজন্ম। চলমান জীবন প্রাপ্ত সেই সভ্যতার দ্বাবা চালিত হয় এবং চলতে চলতেই আবার তার উৎকর্ষ সাধন করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দিয়ে যায়। অবশ্যই পুনরায় উৎকর্ষ সাধনের জন্য। তাই, বাস্তব চিত্র-চেতনাই হতে পারেনা সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য। তার মধ্যে থাকবে সমাজটা কেমন হবে সেকথাও। এ হলো সাহিত্যিকের সভ্যতার প্রতি দায়। অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। এটা পালিত হতে পারে সমাজ-জীবন সম্বন্ধীয় অতীত জ্ঞান, বর্তমানের অভিজ্ঞতা আর ভবিষ্যতের জন্য নির্ভুল পরিকল্পনা থাকলে। এই তিনটি শর্ত পালিত হলেই সৃষ্টি করা যাবে বস্তুবাদী সাহিত্য। প্রগতি বা বস্তুবাদী সাহিত্যিককে পূরণ করতে হবে তিনটি শর্ত: অতীত ইতিহাসের জ্ঞান, চলতি সমাজ-জীবনের অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যৎ সমাজ-জীবনের রূপরেখা এবং তাকে নিয়ত সংগ্রামে নিয়োজিত থাকতে হবে তার চিন্তার বাস্তবায়নে।

অতীত জানা হলো সমাজকে সেই ভাবে জানা যা বলবে, সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন কেমন ছিল এবং কী কী কারণে তারা বিবর্তন ঘটেছিল। বর্তমান জানা মানে, আর্থ-সামাজিক রূপ, ঐতিহাসিক

পারম্পর্য, শাসকের শ্রেণী চরিত্র এবং শোষিতকে চিহ্নিত করণ। ভবিষ্যৎ আমরা গড়তে পারি। তাই ভবিষ্যৎ জানা বলতে বুঝতে হবে পরিকল্পিত সমাজের জন্য নিরলস শ্রমদান। এ চেষ্টা চালনা। চিন্তাকে বাস্তব রূপদানের জন্য কাজ করে যাওয়া। এটা করা সম্ভব হবে যদি রাজনৈতিক বিবর্তন তত্ত্ব এবং তার স্বরূপ জানা থাকে। এই তিনটি শর্তের একটু বিস্তৃত পরিচয় নিতে হবে আমাদের। কেননা, বস্তুবাদী বা প্রগতি সাহিত্যকে জানতে হলে, তা সৃষ্টি করতে হলে, অন্য পথ নেই। নির্দিষ্ট পথে চলতে হলে এবং স্থির লক্ষ্যে পৌছতে হলে 'পথ' এবং লক্ষ্য, জেনেই পথে নামতে হবে।

সমাজ ব্যবস্থার ক্রম বিবর্তন

সমাজ গঠনের মৌল উপাদান কী? কেমন করে সমাজ তার সমকালীন কাঠামো পেল? কবিতা, গল্প অথবা উপন্যাস লিখে কিংবা ছবি এঁকে কীভাবে তার রূপান্তর আনা যায়! যায় কি আদৌ? সমাজের বিবর্তন কেন ঘটবে এবং কখন ঘটবে? সমাজ প্রগতির মাপক কী হবে? এসব প্রশ্ন হলো, সমাজ বিবর্তন জানার প্রশ্ন। ইতিহাস এবং ইতিহাসের দর্শন জানার প্রশ্ন। অতীত জানার সমস্যা।

আমরা বর্তমানে যে সমাজে বাস করছি বিবর্তনের মধ্য দিয়েই তাকে আমরা পেয়েছি। ধর্ম-কাহিনীতে, হঠাৎ একদিন বিশ্ববিধাতার বিশ্বসৃষ্টির উল্লেখ আছে। বলা হয় ঈশ্বর বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন ৪০০৪ খ্রীঃ পূঃ অব্দে। কিন্তু সমাজে 'একদিনে' কিছু ঘটিয়ে দেওয়া যায় না। যদিও কোন পরিবর্তন আসতে পারে দ্রুত। যেমন রুশ বিপ্লবের পর রুশ সমাজ। আবার তা খুব ধীরে ধীরেও পরিবর্তিত হয়। যেমন আন্দামানের জারোয়া সমাজ কিংবা উত্তর বঙ্গের টোটো সমাজ। এই প্রবহমানতা থাকা সত্ত্বেও সমাজ জীবনের মধ্যে কয়েকটি ভাগ লক্ষ্য করা যায়। আদিতে ছিল 'শ্রেণী পূর্ব' সমাজ, তারপর এলো 'শ্রেণী বিভক্ত' সমাজ। সমাজের যে তৃতীয় রূপটি কল্পনা করা হয়, তা হলো 'শ্রেণীহীন' সমাজ। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জন করতে হবে এই শ্রেণীহীন সমাজ। আর সংগ্রামের জন্য চাই উপযুক্ত হাতিয়ার। সাহিত্য-শিল্প—তাবৎ সুকুমার কলার দায় হলো এই সংগ্রামী জনতার জনমত গঠন। তাকে প্রেরণা দেওয়া এবং উৎফুল্ল রাখা। লেখক দেখাবেন, ভবিষ্যতের বেদনাহীন সমাজ গঠনে বাধাটা কোথায়। কে দিচ্ছে সেই বাধা। আর তা অতিক্রম করা যায় কেমন করে। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং প্রতিকার হবে কোন পথে।

'অরিজিন সব স্পিসীজ'—এর লেখক এবং বিবর্তনবাদের জনক

বিজ্ঞানী চার্লস রবার্ট ডারউইন [১৮০৯-১৮৮২] আমাদের জানিয়েছেন বানরকল্প জীব বিবর্তিত হয়ে মানুষ হয়েছে। বলা হলো বটে বানর থেকে মানুষ এসেছে। তা-বলে একথা ভাবার কারণ নেই যে, বানরই মানুষ হয়ে উঠল একদিনে। তা যদি হত, তাহলে এখন আর কোন বানরই আমরা দেখতাম না। চলতে ফিরতে আমরা কুকুর দেখি। মানুষের সব চেয়ে কাছের প্রাণী। নানা জাতের কুকুর আছে। তাদের স্বভাব আকৃতি—প্রকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন। এক প্রজাতির সঙ্গে অন্য প্রজাতির মিল খুব। প্রতিটি প্রজাতিই নিজ নিজ বংশধারা রক্ষা করে চলছে। এরি মাঝে বহু প্রজাতি লুপ্ত হয়েও গেছে। কোনটি বা আকারে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আবার কোনটি বা লুপ্ত হয়ে গেছে। মাছ দেখলেও এটা ধরা যায়। এই পরিবর্তনের কাজটা কিংবা লুপ্ত হয়ে যাওয়া, দীর্ঘ সময় ধরে বিবর্তনের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

বানর থেকে মানুষও হয়েছিল এ-ভাবেই বিবর্তিত হতে হতে। আর তা ঘটেছিল বানরের কোন একটা প্রজাতির ক্ষেত্রে। সময়টা, বিজ্ঞানী-গ্রাহ্য পরিভাষায় হলো, টাশ্যারি পিরিয়ড বা তৃতীয় ভূ-স্তর যুগ বলে যা উল্লিখিত হয় তখন। প্রাণীদের মধ্যে অন্যের থেকে মানুষের তফাৎ হচ্ছে হাতের ব্যবহারে, হাতের এমন সুনিপুন ব্যবহার অন্য কোন প্রাণীর পক্ষেই সম্ভব হয়নি। বানরদের সেই প্রজাতিটি অথবা সেই সেই প্রজাতিগুলিই বিবর্তিত হয়ে মানুষ হলো যে বা যারা, অপেক্ষাকৃত পটু ছিল হাতের ব্যবহারে। পায়ের উপর দেহের ভার রাখা—'নিজের পায়ে দাঁড়ান' আর কি, আর হাত দিয়ে শ্রমকে ফলপ্রসূ করেই তৈরী হলো মানব সভ্যতার বনিয়াদ। মস্তিষ্কের ব্যবহার পরের ধাপে। কিন্তু যখন তা এলো, তখনই মানব সভ্যতার সৌধ রচিত হল। প্রতি প্রজন্মেই পাল্টে গেছে হাতের ব্যবহার। আর তার ফলে শরীরের কাঠামোটাও যেত বদলে। যত পাল্টে গেছে শরীরের গঠন ততই প্রয়োজন হয়েছে মস্তিষ্ক চালনার। আত্মরক্ষার কৌশল প্রয়োগের জন্যই উন্নত হয়েছে মস্তিষ্ক। মানুষ তার কলা-কৌশল দিয়ে যেতে থাকল পর-প্রজন্মকে। পূর্ব জ্ঞান আর নতুন

অভিজ্ঞতার মিলনে দ্রুত এগিয়ে চলছিল মানব-সমাজ। এইভাবেই এলো পূর্ণ মানুষ। এই প্রক্রিয়া অবিরাম চলছে। চলবেও।

ভূমিতে শিকার করা আর জলে মাছ ধরা, খাদ্যের জন্য মানুষের প্রধান অবলম্বন ছিল এদুটোই। কেননা, সে পর্বে ফল-মূলের যোগান ছিল ঋতু নির্ভর। মানুষকে অন্য জীব থেকে যা একেবারেই আলাদা করে দিল তা হলো মাংসাহার এবং শব্দের ব্যবহার। টিকে থাকার জন্য দুটো ঘটনা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম, মানুষই একমাত্র সর্বভূক প্রাণী—এবং সে সব ঋতুতেই মানিয়ে চলতে পারে। দ্বিতীয়তঃ আগুনের ব্যবহার করা এবং পশু পালন আর সেই পশুর মাংস খাদ্য হিসেবে পাওয়ার নিশ্চয়তা বোধ।

এখনও আমরা পরিবেশ-চেতনাহীন। পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত করি। এ-হলো বংশধারা। আদিম মানুষও এটা করত। অবশ্য এখন আমরা প্রতিবিধানের পথ জানি। আদিম মানুষ প্রকৃতি-নিধন করে আর তার প্রতিকার করতে পারত না। তাই, তারা কৃষি কাজ শিখতে বাধ্য হল। প্রকৃতির উপর অধিকার রক্ষার তাগিদেই এটা করতে হল। কৃষির প্রয়োজনে চাই জমি। আর জমির জন্য যেতে হলো স্থান হতে স্থানান্তরে। ডাঙ্গা-পথ সব সময় পাওয়া যায়নি, তাই শিখতে হলো জলযান নির্মাণ ও চালনা। ক্রমে গড়ে উঠল সমাজ এবং মানুষের প্রিয়তম সংগঠন পরিবার ব্যবস্থা। এর পর এলো ধর্ম বোধ। কেননা, অতিপ্রাকৃতের ব্যাখ্যা তার জ্ঞান-সীমায় অধরা। কিন্তু মনের গতি রুদ্ধ করবে কে? সে হলো বুদ্ধ শিষ্য, আনন্দের মত। সে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে। তারপর? তারপর? সমকালের সমাজ নিরুত্তর থাকে। কিন্তু চিরকালের মুক্তমন নিজেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নেয়। পৃথিবী না সূর্য, কে ঘুরছে! ধর্মীয় নেতা বলে, সূর্য। মুক্তমনা বিজ্ঞানী বলে, না পৃথিবীই ঘুরছে। এইভাবেই এলো বিজ্ঞান। জয় হলো যুক্তির। প্রয়োজন থেকে আসে প্রশ্ন। প্রশ্নের উত্তর দেয় মুক্ত মন যুক্তি। চিন্তণ প্রক্রিয়া বিশ্বাসের উপর স্থান পেল। ফলে ধর্মাচারের

একাধিপত্য খর্ব করলো বিজ্ঞান। এখনও কিন্তু বিশ্বাসী মনের আপ্তবাক্য চালু আছে। সে বলে—"বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।" একালের শিল্পীর দায় বিশ্বাসের উপর যুক্তির প্রতিষ্ঠা। সমাজ বিবর্তনের আরও একটি অতি প্রয়োজনীয় দিক আছে। সেটি শোষণের দিক। সেটা আসবে প্রসঙ্গান্তরে। এই পর্যায় জানা গেল, মানুষ বিবর্তিত হয়েছে। সমাজহীন পর্যায় থেকে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়েছে। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় যুক্তি দখল করেছে বিশ্বাসের স্থান। মানুষ হলো মননশীল জীব। যুক্তির আলোকে উদ্ভাসিত সত্যকে দেখাই শ্রেষ্ঠ দেখা। আদিম মানুষ প্রশ্ন করেছিল 'তারপর'। একালের মানুষের উত্তর 'যুক্তির' পর আর কিছু নেই। আর যুক্তির প্রাণ আছে 'সাধারণ' এবং 'বিশেষ নির্বাচন' সম্পন্ন করার মধ্যে। সেটি পারলেই, পরস্পর অভিন্ন নয় এমন সব কিছুই জানা যায়। এই জানাটা, যুক্তি দিয়ে জানাটাই বস্তুবাদীর জানা। যাকে বলা হয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান।

রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও শোষণহীন সমাজ

শ্রেণীপূর্ব সমাজ মিলিয়ে গেল। এলো শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ। সমাজ নিজের মধ্যেই নিয়ত আলোড়িত হচ্ছে। বিবর্তিত হচ্ছে। দ্বান্দ্বিক গতি অমোঘ। তাই, শ্রেণীহীন সমাজও আসবেই।

এই আসা-যাওয়ার নিয়মটা কী। সন্দেহ নেই শ্রেণীদ্বন্দ্বের ফলেই এই বিবর্তন ঘটে। যদিও বিবর্তনেরও একটা নিয়ম আছে। এই তত্ত্বের সঙ্গে এক সময় যুক্ত ছিল হেগেলের [Ceorge Wilhelnm Fredrich Hegel—1770-1831] নাম। বিশ্ববিবর্তনে দ্বন্দ্বমূলক ব্যাখ্যাটাই আমাদের কাছে গ্রাহ্য। প্রথম ব্যাখ্যাতা হেগেল। বস্তুবাদের জনক মার্কস [Heinrich Karl Marx 1818—1883] এবং তার ভাষ্যকার এঙ্গেলস্ [Friedrich Engels 1820—1895] এটা বার বার স্বীকার করেছেন। কিন্তু পদ্ধতি এক হলেও সিদ্ধান্ত হয়েছে দুজনের সম্পূর্ণ বিপরীত। এটা মার্কস নিজেই বলেছেন। মার্কস বলেছেন, তাঁর দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি—"হেগেলীয় পদ্ধতি থেকে শুধু স্বতন্ত্রই নয়, একেবারেই বিপরীত।" হেগেলের কাছে 'আইডিয়া' বা 'মানস' সম্পূর্ণ স্বাধীন সত্তা। পদ্ধতির দিক থেকে 'মননই' হচ্ছে 'বস্তু' বা 'দৃশ্যমান' জগতের স্রষ্টা এবং 'দৃশ্যমান' জগৎ বা 'বস্তুজগৎ'-হলো 'মানসের' বাইরের রূপ। যা কিনা 'দৃশ্যমান'। অপরপক্ষে মার্কসের কাছে 'মানস' মানে মনন রূপান্তরিত 'বস্তুজগতের' 'প্রতিফলন' মাত্র।

এখন 'দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির' সঙ্গে 'বস্তুবাদ' শব্দটি অভিন্ন মনে হয়। শব্দটির আছে ভিন্নতর ইতিহাস। কিছুটা বা ঐতিহ্যও। মার্কস এঙ্গেলসের আগেও শব্দটির প্রচলন ছিল। 'ডায়ালিগো' এই গ্রীক শব্দটি থেকে এসেছে ডায়ালেক্‌টিক্‌স শব্দটি। সে-সময় তর্ক করা অর্থে এটি ব্যবহৃত হত। দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিতে যেমন হেগেল তেমনি ডায়ালেক্‌টিক্‌স প্রসঙ্গে ফয়েরবাখের [Ludwig Feaerbach—1872-1895] নাম উচ্চারিত হয়। সাহিত্যিকের দায় প্রসঙ্গে

এ-বিতর্ক এ-পর্যন্ত থাক। শুধু মনে রাখা দরকার যে, ফয়েরবাখ বস্তুবাদের কথা বললেও আসলে ছিলেন ভাববাদী। আমাদের জানা দরকার তর্ক-বিতর্কের মধ্যদিয়ে সত্যকে ধরার আকাঙ্ক্ষা থেকেই ডায়ালোগ এসেছিল। এটাই এখন থিসিস বা পূর্বপক্ষ, অ্যান্টিথিসিস বা উত্তর-পক্ষ এবং সিনথিসিস্ বা সমবায়! এই মতবাদ বিশ্বাস করে বস্তুজগত প্রবহমান, গতিময় এবং সতত পরিবর্তনশীল। এই তত্ত্বচিন্তার-কাব্যিক প্রকাশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "নদী" কবিতাটি। বলাকা কাব্য গ্রন্থের '৮' সংখ্যক কবিতা এটি। প্রাসঙ্গিক অংশ বিশেষ এই রকম—

"যে-মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে-মুহূর্তে কিছু তব নাই,
তুমি তাই
পবিত্র সদাই।
তোমার চরণস্পর্শে বিশ্বধূলি
মলিনতা যায় ভুলি
পলকে পলকে,—
মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে।
যদি তুমি মুহূর্তের তরে
ক্লান্তি ভরে
দাঁড়াও থমকি
তখনি চমকি
উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে;
পঙ্গু মূক কবন্ধ বধির আঁধা
স্থূলতনু ভয়ংকরী বাধা
সবারে ঠেকায়ে দিয়ে দাঁড়াইবে পথে;—
অণুতম পরমাণু আপনার ভারে
সঞ্চয়ের অচল বিকারে
বিদ্ধ হবে আকাশের মর্মমূলে
কলুষের বেদনার শূলে।
ওলো নটী, চঞ্চলা অপ্সরী,

অলক্ষ্য সুন্দরী,
তব নৃত্যমন্দাকিনী নিত্য ঝরি ঝরি
তুলিতেছে শুচি করি
মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।
নিঃশেষে নির্মল নীলে বিকাশিছে নিখিল গগন।"

লক্ষ্য করার মত, 'মুহূর্ত' শব্দটি স্বল্প ব্যবধানে তিনবার এসেছে। এ ছাড়াও মনযোগ আকর্ষন করার মত শব্দ হলো 'পুঞ্জ', 'বস্তুর পর্বতে', 'স্থুলতনু', 'অণুতম', 'পরমাণু', 'সঞ্চয়', 'শূল', 'মৃত্যুস্নান' এবং 'বিকাশিছে'। তত্ত্বের প্রয়োজনেই এ-সব শব্দ এসেছে।

কোন কিছুই বিচ্ছিন্ন বা স্বয়ম্ভূ নয়। পরস্পর যুক্ত এবং গতিময়। পরিবেশ এবং প্রসঙ্গ বিযুক্ত করে কোন কিছুই দেখা চলবে না। এই প্রসঙ্গেই আসে ইতিহাস। প্রসঙ্গ বা পারম্পর্য হীন অবস্থায় দেখা ঠিক দেখা নয়। শিল্পে যাকে বলে পারস্পেকটিভ সেটা না থাকলে দেখাটা ভূল হবে। একটি ফুলকে ফুলদানীতে দেখা আর পুষ্প শাখায় দেখা তো এক নয়। আবার পুষ্প শাখাকে দেখতে হবে 'বৃক্ষের' পট-ভূমিতে। বৃক্ষকে দেখতে হবে প্রকৃতির মাঝে। প্রকৃতি আছে বিশ্ব-জুড়ে। আবার ভূমিজ কে দেখতে হবে বীজ থেকে। জন্মের রহস্যের আবরণ উম্মোচন করে। বিবর্তনের এই ধারাকে অবলোকন করাই ঐতিহাসিকের দৃষ্টি। এতক্ষণ যা বলা হলো, তা তিনটি শব্দে বলে বস্তুবাদী। শব্দ তিনটি —ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। এই মত-বাদের শর্তে বিশ্ব-বীক্ষণের নাম বৈজ্ঞানিক-বিশ্ব-বীক্ষা।

এই দেখার মধ্যে কখনো আত্মতুষ্টি থাকতে পারবে না। নিয়ত পরিবর্তনের জন্য মনকে প্রস্তুত রাখতে হবে। আজ যা সত্য কাল তা ভুল বলে প্রমাণিত হতেই পারে। তাই সব সময়েই পরীক্ষা চালিয়ে যেতে হবে। সমাধান বলে কিছু ছিল না, বর্তমানে নেই এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। এই মুহূর্তে যেটা মনে হলো সমাধান পর মুহূর্তেই সেখান থেকে দেখা দেবে নতুন সমস্যা। তাই নিয়ত নব নব সমস্যা সমাধানের প্রস্তুতিই হলো বৈজ্ঞানিক চেতনা বা মন।

যেহেতু এই মতবাদকে আমরা বৈজ্ঞানিক মতবাদ বললাম, তাই বিজ্ঞানের প্রথম শর্ত—একটি শব্দের একটি অর্থ, আমাদের মানতে হবে কিংবা তৈরী করে নিতে হবে। অন্ততঃ বিশেষ কতগুলি শব্দের একটি অবিভাজ্য, অন্যনিরপেক্ষ এবং অপরিবর্তিত অর্থ থাকতেই হবে। সেই শব্দগুলি এবার জানা যাক।

বস্তুবাদী এবং ভাববাদী ধারণার অবস্থান বিপ্রতীপ। সাহিত্য কিংবা শিল্প হলো মনের উপর বস্তুর প্রতিফলনের বর্ণনা। অর্থাৎ বস্তু প্রধান এবং প্রথম। ভাববাদীর বিশ্বদর্শন এ-ভাবে হয় না। তার কাছে প্রথম, প্রধান ও স্থির সত্য হল 'মানস' এবং মননজাত আধ্যাত্মিক ভাব-কল্পময় 'জগৎ'। এই 'পরা-জগৎ' নির্ভর দৃশ্যমান বস্তুজগৎ। যদিও বস্তুজগৎই আমরা দেখি। 'মনন' বস্তুর প্রতিফলন নয়, ভাববাদীর কাছে। 'বস্তুজগৎ' বিযুক্ত 'মানস' ভাববাদীর কাছে বাস্তব। গন্ধ বা স্পর্শ'র প্রতিক্রিয়া মনন নয়। মন বলছে বলেই 'গন্ধ'টা গন্ধ! এই জগতের অবস্থান কোথায়, জ্ঞানের বাইরে? অথবা অবস্থান তার বিশ্বাসে! হ্যাঁ, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্ক বহুদূর। এ-সব শব্দ শব্দ-জ্ঞানানুপাতিক-অতিব্যঞ্জনাময়-অর্থহীন ধ্বনি সর্বস্ব বিকল্প শব্দ মাত্র। এবং ভাববাদীর জগৎ ওতেই ধরা দেয়। এ-জগৎ নেতি নেতি করে জানতে হয়। অধরা অনুভূতির দ্বারা ধরা জগৎ।

বস্তুবাদীকে এ-ভাবে জগৎ ব্যাখ্যায় নামতে হয় না। তার কাছে জগৎ পদার্থময়। তা নিয়ত পরিবর্তনশীল। এই জগৎ মন-নিরপেক্ষ। আব আজ না-জানলেও এই জগতের সবকিছুই জানা সম্ভব। বস্তুবাদী তাই জেনেছে বস্তু-গতিসর্বস্ব হয়েও সাময়িকভাবে গতি-বিরতিতে ভুগতে পারে। আবার দ্রুতগতিময় কিংবা পশ্চাৎগতিময়ও হতে পারে। এখন জিন-বিজ্ঞানী যেমন বলছেন, ঠিক সেইভাবেই জীবন গতিময়। জীবন নিয়ত নতুন জিন-যুক্ত হচ্ছে। আবার পুরাতন ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে কিন্তু লয়প্রাপ্ত হচ্ছে না। কোনটা বা বেড়ে যাচ্ছে। এই পরিবর্তন গুণগত কিংবা পরিমাণগত অথবা উভয়তর হতে পারে।

পরিবর্তন অবশম্ভাবী। এ নিয়মটা জানলে এবং মানলে একটা

দায়িত্ব আসে। তা হলো এই পরিবর্তনকে যারা মানেনা কিংবা বিপরীতমুখী করার ব্যর্থ চেষ্টা করে, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের এবং প্রতিবাদের শপথ নিতে হয়। কাজ করতে হয়। এই কাজের জন্যই উদ্ভব হয় বিপ্লবীশ্রেণীর। আবার বিপ্লবীকে হাতিয়ার রাখতেই হয়। কামান-বন্দুক একমাত্র হাতিয়ার নয়। অন্যতম। শিল্পী আর লেখকও হাতিয়ার নেয় হাতে। নাম তার তুলি আর কলম। রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রয়োজনে।

বানর রূপান্তরিত হলো মানুষে। গোষ্ঠীভুক্ত সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে যাচ্ছিল। পত্তন হচ্ছিল শ্রেণীবিভক্ত সমাজের। তার একদিকে সংখ্যা গরিষ্ঠ শোষিত শ্রেণী অন্যদিকে সংখ্যালঘিষ্ঠ শোষক শ্রেণী। এই সমাজে ধর্মাচার এলো জাঁকিয়ে। তার ভূমিকা খুবই গুরুত্ব পাচ্ছিল। এদের কাজ সমাজের বর্তমান রূপটায় বিশ্বাসী করে তোলা এই শ্রেণীকে। অথচ ধর্মাচারের বাইরে, তার রীতি নীতির বাহিরে, থাকতেন শোষক। তাই, শোষিতের মুক্তি সংগ্রামে ধর্ম-বিরোধিতা একটা বড় লক্ষ্য হয়ে উঠল।

সামাজিক দ্বন্দ্বে ধর্মাচার-প্রচারক তাই সবসময়েই নিত রক্ষণা-াশীলদের পক্ষ। রাষ্ট্র ব্যবস্থার রক্ষণে যেমন তেমনি পরিবর্তনেও। কিন্তু ধর্মের একটা ভূমিকা আছে। প্রতিবাদী ধর্মও দ্রুত হয়ে উঠে রক্ষণ-শীলদের দুর্গ। মার্কস তাই, সঠিকভাবেই বলেছেন, 'ধর্ম' হলো 'দীর্ঘশ্বাস' আর 'হৃদয়হীন দুনিয়ার করুণার কথা'।

এ-সব কিছুই থাকে সমাজে। রাষ্ট্র দখল করে যা রক্ষা করে শোষক। তারা ভাববাদ প্রভাবিত হয়ে সরকারকে স্থায়ী ভাবেন। তাতো নয়। রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ও চলবে দ্বান্দ্বিক বিবর্তনের নিয়মে। পূর্বপক্ষ সেখানে শোষক। উত্তরপক্ষ শোষিত; সমন্বয়ের দ্বারে আসবে শ্রেণীহীন রাষ্ট্র ব্যবস্থা। বস্তুবাদীর কাছে :রাষ্ট্রবিবর্তনের এই মতবাদে আস্থা অপরিহার্য।

অর্থনীতি ও শ্রেণীযুদ্ধ

শ্রেণী-পূর্ব সমাজ ব্যবস্থা বেশ চলছিল। সঞ্চয় নেই তাই শোষণও নেই। সঞ্চয় করতে না পারলে শোষণের মজাটাই থাকেনা। প্রয়োজন ক্ষুন্নিবৃত্তির। শিকার আশু ফল লাভের জন্য। আশুতোষেরাই ছিল সংখ্যাগুরু। বিরোধ-বিদ্বেষটা কম ছিল। কিন্তু সমাজের অগ্রগতিও ছিল না। সঞ্চয় না হলে বিনিয়োগ হয় না। বিনিয়োগ না হলে নতুন নতুন উৎপাদন মাধ্যম দেখা দেয় না। উৎপাদন ব্যবস্থায় বিভাজন না-এলে নব-উৎপাদন ব্যবস্থা আসে কী করে। আবার এও মনে রাখতে হবে, সঞ্চয়ের সঙ্গে যোগ আছে শোষণের। প্রশ্ন হলো, সঞ্চয়টা কার হাতে থাকবে?

সঞ্চয় চাই কিন্তু শোষণ থাকবেনা, এ-কথা তখন ভাববার প্রয়োজনই ছিল না। যখনই জমির টান পড়েছে, মানুষ যাযাবরের মত নতুন জমির জন্য স্থানান্তরে গমন করেছে। এইভাবে প্রাচীন সমাজ গোষ্ঠী, ব্যক্তি মালিকানা যার মূলকথা, তা খাদ্যের প্রয়োজনে বারে বারে বিপর্যস্ত হতো। এ-ভাবেও দীর্ঘদিন চলতে পারেনা। জমির যোগান সীমাবদ্ধ। বিশেষ করে কৃষি জমির। যার আছে উৎপাদিকা শক্তি।

প্রয়োজন বোধই অল্প জমিতে বেশী উৎপাদনের চিন্তা আনলো। এই চিন্তা থেকেই এলো উন্নত কৃষি পদ্ধতি। অধিক উৎপাদনের প্রয়োজনে, তখনকার মানে উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োজন হলো। সেটা মানুষ আবিষ্কারও করলো। যার বা যাদের হাতে সেই প্রযুক্তি থাকল, শোষণ, সঞ্চয় এবং শ্রেণী বিভক্ত সমাজের সূচনা 'সে' বা 'তারাই' আরম্ভ করলো। দেখা দিল প্রভু এবং দাস শ্রেণীর। এতো বিনিময়ের অর্থনীতি। এই বিনিময়ের পথ ধরেই এলো লাভের এবং লোভের যুগ। শুরু হলো বিনিময়, বিক্রয় এবং মুনাফা। এই বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন এবং বিনিময় বা বিক্রয়ের প্রসঙ্গে এলো অর্থনীতি। তার মূল কথাটা কী?

মার্কস ধর্মকে আফিমের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাও শাসক প্রজাকে খাওয়াবে ততদিন যতদিন তার প্রয়োজন। ১৬৩৬-এ ইংল্যাণ্ডের আইনসভা ধর্মগুরু পোপকে অর্থ দিতে অস্বীকার করে। অর্থনীতি, দেখা যাচ্ছে আপন প্রয়োজনেই ধর্মবিরোধী হয়ে ওঠে। প্রথমে বিনিময় ছিল বস্তুর সঙ্গে বস্তুর। তার স্থান নিল রাজ-অনুমোদিত 'অর্থ' বা 'টাকা'। ইতিমধ্যেই বিনিময়ের মাধ্যমরূপে অর্থের ব্যবহার বেশ জোরদার হয়েছে। আর তা সঞ্চয় করে গোপন রাখাও হলো সহজ। ফলে সঞ্চয়কারী কখনো বিনিয়োগ না করে, আবার কখনও নিজস্বার্থে বিনিয়োগ করে সমাজ ব্যবস্থাটা টালমাটাল করে দিচ্ছিল। এলো শিল্প বিপ্লব। অর্থ যার হাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তার ইচ্ছার প্রয়োগ তাই আরও সহজ হলো।

মালিক তার কথা ভেবেই চলতে চায়। কিন্তু রাজাকে প্রজার কথা সামান্য হলেও ভাবতে হয় বৈকি। টাকাটা যখন ব্যবসায়ীর হাতে তখন রাজাকে মাঝে মধ্যেই অর্থের টানাটানিতে পড়তে হয়। সেটা প্রজার পক্ষে নির্মম যন্ত্রণার। রাজার হয়ে মন্ত্রীকে একটা পথের কথা ভাবতেই হয়। অর্থনীতি নিয়ে ভাবনার জনক হলেন এডাম স্মিথ [1723-1790]। প্রায় শেষ প্রান্তে এসেছে অষ্টাদশ শতক। স্মিথ লিখলেন, "ওয়েলথ অব নেশন।"

এখন যে বইকে বলা হয় ধ্রুপদী অর্থনীতির প্রথম বই। স্মিথ ছিলেন দার্শনিক। তাঁর লেখায় তাই আছে অর্থনীতির দর্শন। দর্শনের ভিত্তি হলো, যুক্তি-বিজ্ঞান। এডাম সাহেবের লেখায় এবং ক্লাসিক্যাল সব অর্থনীতিবিদের লেখায় যুক্তি তর্কের একটা ভূমিকা থাকে। স্মিথের প্রথম প্রশ্ন : আর্থিক উন্নতির কারণ কি? সোনা বা রূপা রাজ কোষাগারে জমলেই দেশের আর্থিক উন্নতি হয়কি? নাকি রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুকিয়ে আছে অন্য কোথাও?

সম্পদ আর কিছুই নয়। শ্রমই সম্পদ। শ্রমের দক্ষতা হলো সম্পদের প্রসার। উন্নত যন্ত্র এবং ব্যবহারের দক্ষতাই পারে নতুন সম্পদ সৃষ্টি করতে। সুতরাং সম্পদ বাড়ান মানে দক্ষতা বাড়ান।

দক্ষতা বাড়ে নির্দিষ্টভাবে কাজটা সব চাইতে সার্থকভাবে এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে করতে পারলে। তার জন্য নির্দিষ্ট কাজ নির্দিষ্ট লোকের মধ্যে ভাগ করে দিতে হয়। একে বলা হয় 'শ্রমবিভাজন'। শ্রম বিভাজনের সঙ্গে বাজার বিস্তারের একটা যোগ থাকে। বাজার প্রসারের সঙ্গে শ্রম বিভাজন অপরিহার্য হয়ে উঠে। ধন অর্থাৎ অর্থের প্রয়োজন কিন্তু এ-ব্যবস্থায় অপরিহার্য। শিল্প বিশেষ করে আধুনিক বড় বড় শিল্পের থাকে দীর্ঘ জেস্টেশন পিরিয়ড। এই সময় শ্রমিককে দিতে হয় বেতন। এটা দিতে হয় অর্থে। একে মূলধন বলা হয়। এডাম স্মিথ এই অর্থের জন্য সঞ্চয়ের নির্দেশ দিলেন। শিল্প প্রসারের জন্য সঞ্চয় বাড়াতেই হবে। এ-পর্যন্ত ব্যাপারটা ঠিক ছিল।

বস্তুবাদীর পক্ষ থেকে দুটো প্রশ্ন রাখা হয়। সঞ্চয়টা কে কিভাবে করবে আর তা কার হাতে থাকবে। বিনিয়োগ কে করবেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা হবে। পুঁজিপতি শ্রমিক শোষণ করে সঞ্চয় করে। সঞ্চয়টা থাকে তারি হাতে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কে। পুঁজিপতি এই সঞ্চয় সেই সব ক্ষেত্রেই বিনিয়োগ করবে যেখান থেকে তার মুনাফা হবে সর্বাধিক। মানুষের প্রয়োজন তার কাছে বিচার্য নয়। এর ফলে অর্থনীতি একপেশে হয়ে পড়ে। শ্রমিক হয় আরো শোষিত।

এ-মতের এবং ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে বহু-কণ্ঠে। তার মধ্যে পুঁজিবাদী সমাজ সমর্থকও ছিলেন। কিন্তু সত্যিকার সমস্যা দেখিয়ে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা যিনি বললেন, তিনি শ্রমিক দরদী মহান কার্ল মার্কস। মার্কসের হেতু বাক্য, বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত এইরকম :—দ্রব্যের মূল্য নির্ধারক হচ্ছে 'শ্রম'। এই শ্রম ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নিজেই আবার একটি পণ্য। শ্রমিক তার শ্রমের জন্য মূল্য পায়। এই মূল্য এবং তার শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত মূল্যের মধ্যে পার্থক্য থাকে। পণ্যের মূল্য শ্রমিকের মজুরী অপেক্ষা বেশী হয়। এই ব্যবধানটা অর্থাৎ শ্রমিকের উৎপাদিত মূল্য এবং মজুরীর ব্যবধানটাই তালো

মুনাফা। একে বলা হয় উদ্‌বৃত্ত মূল্য। এই উদবৃত্ত মূল্যটা থাকে মালিকের হাতে। এর নাম শোষণ। শ্রমিক কতটা শোষিত হলো তার পরিমাপ হয় উদ্‌বৃত্ত অর্থের মূল্যে। শোষক পুষ্ট হয় এই উদ্‌বৃত্ত মূল্যের দ্বারা।

যদি শ্রমিকের চাহিদা মিটিয়ে এই উদ্‌বৃত্ত অর্থ কল্যাণকামী রাষ্ট্র নিজের হাতে নিয়ে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করতে পারে তবে সমাজের কল্যাণ করা যায়। এইভাবে বিনিয়োগের দ্বারা নতুন নতুন শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকের চাহিদা সৃষ্টি হবে। ফলে কর্মসংস্থান বাড়বে। বাড়বে মজুরীও। একটা চমকে দেওয়ার মত সিদ্ধান্তে এসেছিলেন এডাম স্মিথ তার তত্ত্ব বিশ্লেষণের এই পর্যায়ে। মজুরী বাড়তে পারে সমাজে পণ্যের চাহিদা বাড়িয়ে এবং শিল্প বিকাশের দ্বারা পণ্যের চাহিদা বাড়বে তখন যখন পণ্যটি হবে সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয়। স্মিথ বললেন, শ্রমিকের যোগান কমিয়ে মজুরী বাড়াতে হবে। শ্রমিকের যোগান কীভাবে কমবে! ম্যালথাসের মতো তিনিও বলেছেন, জন্ম নিয়ন্ত্রণ কর। এটা একটা সান্ত্বনার ব্যাপার যে স্মিথও শ্রমিকের মঙ্গল চেয়েছিলেন। যদিও এটা খুবই দুঃখের যে, একজন দার্শনিক সমসাময়িক চিন্তার চাপে কতটা যুক্তি বিমুখ হতে পারেন।

রাষ্ট্র ক্ষমতা পেলে, উদ্‌বৃত্ত অর্থ হাতে পেলেই কী সমস্যা মিটবে রাষ্ট্র তো স্মিথের সময়ও ছিল। এ-প্রশ্নের উত্তর ও মার্কস দিয়েছেন, তার রাষ্ট্রব্যবস্থা বিশ্লেষণের মাধ্যমে। হেগেলের জাতি রাষ্ট্র থেকে মার্কস সাম্যবাদী সমাজের যে রূপরেখার কথা বলেছেন তার মধ্যে এর সমাধান দেওয়া হয়েছে। এই সমাজ ব্যবস্থা কাম্য হলেও তার প্রতিষ্ঠায় বাধাও বিস্তর।

পুঁজিবাদী সমাজপতিরাও চেষ্টা করেছে সমস্যা সমাধানের। কিন্তু তাদের সিদ্ধান্তগুলি কখনোই তাদের স্বার্থের সঙ্গে মিলে যায়নি। ওরা উপযোগবাদের প্রয়োগ করে রাষ্ট্রের সমস্যা সমাধানে ব্রতী হয়েছে। কিন্তু তার দ্বারা ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির তেমন মিল হয়নি

সামাজিক অস্থিরতা তাই দূর হয়নি। ফলে, সেই অস্থিরতা রোধে সমাজ বেশী বেশী নির্ভরশীল হয়েছে 'আমলাতন্ত্র' এবং 'শক্তির' উপর। আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজ বৃহৎশিল্প-আমলা-প্রতিরক্ষার পারস্পরিক নির্ভরতা এবং রক্ষায় গড়ে উঠল। শুরু হলো এই ত্রয়ীর সঙ্গে শোষিতের সংগ্রাম। এর মাঝখানে আছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এরা লড়াই করে না। বিজয়ীর হাতের মোয়া খায় সবসময় সব যুগে। চলছে তাই শ্রেণীযুদ্ধ। শেষ যুদ্ধের আগে পর্যন্ত এটা চলবে।

সাহিত্যিকের দায়

এই পটভূমিকায় সাহিত্যিকের দায় কতটা? ভূমিকাই বা কী হবে তার? কখনো কখনো বস্তুবাদী সাহিত্য বিচারে একটা বিভ্রান্তি এসে থাকে। বিপ্লবের প্রতি আনুগত্য প্রকাশেচ্ছু অত্যুৎসাহীগণ রায় দানের একচেটিয়া অধিকার চান। তারা অথবা কেউ কেউ মনে করেন, শেষ কথাটা তারাই বলবেন। এরা বলে থাকেন সমাজ বিবর্তনে বন্দুকই বলে শেষ কথা। তাই তাঁদের দাবী, সাহিত্যিককেও কলম অপেক্ষা অধিকতর পারদর্শী হতে হবে বন্দুক চালনায়। মসিজীবীর জন্য এটাই কী শেষ কথা?

সমকালে মানুষের পূর্ণ প্রকাশ—যতটা পূর্ণ হতে পারে সামাজিকের জীবনে, তা ঘটেছিল লেনিনের মধ্যে। [Vladirmir Ilyich Ulyanov Lenin, 1870—1924] বিপ্লবীদের তিনি বিপ্লবী। ঔপন্যাসিক গোর্কিকে নিয়েও এরকম বিতর্কের সূত্রপাত হয়ে ছিল। [Alexai Maximovich Peshkov Gorky, 1865—1936] বলা হত, গোর্কি জীবনের সদর্থক নয় নঙর্থক দিকটাই প্রকাশ করেন। তাঁর বক্তব্য যথেষ্ট বৈপ্লবিক হচ্ছে না। লেনিন গোর্কিকে সমর্থন করেছিলেন। গোর্কি আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেছিলেন, আমি যাদের

যে রকম দেখছি তাদের সেরকমই দেখাচ্ছি। ওদের জীবন আমি জানি। ওরা ও রকমই। আপামর জনতার প্রতিক্রিয়ার দ্বারাই সাহিত্যের ভালো-মন্দ বিচার করতে হবে। সাহিত্য নঙর্থক হতেই পারে। দেখতে হবে তা জনতা গ্রহণ করছে কিনা। আবার গ্রহণের পর প্রতিক্রিয়া সদর্থক হচ্ছে কি না।

কমরেড জ্যোতি বসু সাহিত্যিক নন। তিনি রাজনীতিবিদ এবং প্রশাসক। সম্প্রতি তিনি এক সাক্ষাৎকারে এই ধরণের একটা মত প্রকাশ করেছেন। যা বিশ্লেষণাত্মক এবং ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাজাত। "তবে এও আমি দেখেছি, কমার্শিয়াল যাত্রা নয়, সুস্থ সংস্কৃতিমূলক পালা বিশ বাইশ হাজার গ্রামবাসী সারা রাত ধরে শুনছে, আমিও হয়ত বসে আছি তাদের সঙ্গে। আমাদের দুর্ভাগ্য হলো এই, আইন করে ত আর অপসংস্কৃতি বন্ধ করা যাবে না, যায়ও না। এটাকে আটকাতে হলে আমাদের এমন কিছু পরিবেশন করতে হবে যা প্রগতিশীল সুস্থ সংস্কৃতিমূলক, শুধু তাই নয় মানুষকে আনন্দ দেবার ক্ষমতাও থাকা চাই। শুধু রাজনীতির কচকচি নয়। রাজনীতির কথা বললেই সাহিত্য হয় না, সংস্কৃতি হয় না। ওই স্রোত রুখতে হলে আইন নয় চাই পাল্টা পরিবেশন, যে পরিবেশনার উপাদানে আনন্দ থাকবে। শুধু রাজনীতির কিছু কথা বলে দায়সারা করলে চলবে না।"

কেবলমাত্র রাজনীতি — সক্রিয় রাজনীতির দাবি তো শুধু গোর্কির কাছেই করা হয়নি। করা হয়েছিল এদেশেও এবং দায়বদ্ধ লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও। স্বাধীনতার পর সশস্ত্র বিপ্লবের সময় বলা হয়েছিল, লেখকরা বেড়ার ধারে বসে কেন? ঝাঁপিয়ে পড়ুন হাতিয়ার নিয়ে। মানিক সে বিতর্কে যোগ দেননি! কিন্তু উত্তর দিয়েছিলেন, "ছোট বকুলপুরের যাত্রী" লিখে। এক গাঁয়ের বঁধূও নিজের অজ্ঞাতসারে প্রতিবাদে-প্রতিরোধে-প্রতিকারে সামিল হয়। "বাচ্চাটাকে বুকে চেপে ধরে আন্না চাপা গলায় বলে, দেখব আবার কি? হাঙ্গামা হয়েছে পাহারা বসেছে, না তো কি থেটার

হবে। হাবার মতো দাঁড়িয়ে থেকো নি, যাই চলো।" পুলিশের ভয় ও ব্যারিকেড ভাঙার এই প্রচেষ্টার নামই বিপ্লব। এবং প্রগতিও। মানুষের মনজগতে বিপ্লব ঘটেছে। এটা তৈরী করা এবং জানিয়ে দেওয়াই লেখকের দায়। ময়দানে লড়াইয়ে যে কেউ সামিল হতে পারে। তবে তার জন্য অন্যকেই প্রস্তুতি নিতে হয়।

স্রষ্টা নিবেদিত তার সৃষ্টির কাছে। দায় তার সমাজ মানস প্রতিফলনের। বিপথগামী মানস প্রকাশ এবং তার পরিবর্তনের জন্য সাহিত্যিককে দায় নিতে হবে। বালজাক ছিলেন রাজতন্ত্রী [Honore De Balzac, 1799—1850] এবং চেয়েছিলেন আদর্শ রাজতন্ত্র। তাই রাজতন্ত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংস্কারের জন্য সৃষ্টি করলেন এমন সব চরিত্র, যারা সংস্কারের অভাবে সীমাহীন বিড়ম্বিত। রসদ এলো বিপ্লবীর হাতে। সে দেখল দেশ ক্ষোভে ফুটছে। প্রতিবাদের ডাক দিলেই মিলবে সমর্থন। হয়েও ছিল তাই।

রাজতন্ত্রী হবস্ রাজতন্ত্রের সমর্থনে লিখেছিলেন তার লেভায়াথান গ্রন্থ। [Thomas Hobbes, 1588—1679] তার বক্তব্যের বিরোধীতা এসেছিল রাজতন্ত্রীদের কাছ থেকেই। রাজতন্ত্রীদের মনে হয়েছিল হবস্ রাজতন্ত্রের বিরোধীতা করছেন, সমালোচনা করছেন। হবস্ কিন্তু চেয়েছিলেন রাজতন্ত্রের ত্রুটি দূর করে তাকে বিশুদ্ধ করতে। আসলে সাহিত্যিকের দায় সত্য প্রকাশের, যথাযথ চিত্রণের। সচেতন থাকতে হবে—তা যেন প্রগতিশীল মানস বিকাশে সহায়ক হয়। তার ভালোমন্দ বিচার হলো সত্যবিচ্যুতির দায় মাত্র। সত্যের স্বরূপ স্রষ্টাকেই ব্যাখ্যার অধিকার দিতে হবে। বিচ্যুতির বিরোধীতা করা দ্বিতীয় পর্যায়। স্রষ্টার দৃষ্টিশক্তিকে অস্বীকার করলে তার চিত্রণে সত্য থাকে কী করে? অপরের চোখের দেখা আর না-দেখা সমার্থক। আত্মমগ্ন নয়, আত্মচেতনা আত্মবিশ্লেষণেই আসবে। এই দেখাটা দুদিক থেকে বিচার করতে হবে। দেখার দক্ষতা এবং দেখার মানসিকতা। দেখার দক্ষতা শিল্পীকেই অর্জন করতে হবে। যেমন দেখে ক্যামেরা। লেন্সটা ময়লা ধরা হলে ছবিটা হবে অস্পষ্ট এবং তাই ভুল। দেখার স্পষ্টতা

আসবে মন-লেন্সের সদা-সতর্ক থাকার উপর। এইখানেই আসছে "মানস" গঠন এবং মনন-ক্রিয়ার প্রশ্ন। শিল্পী মানসগঠন নির্ভুল হবে, মনন-ক্রিয়া নির্ভুল হলেই। মনন-ক্রিয়া নির্ভুল হবে, নির্ভুল দর্শন-বিশ্বাসে। দ্বন্দ্বমূলক-বস্তুবাদই এই নির্ভুল জীবন দর্শন দিতে পারে।

১৯১৯ সালে রয়্যাল অ্যাষ্ট্রনমিক্যাল সোসাইটির এক যুক্ত অধিবেশনে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন একটি ভাষণ দেন। [Albert Einstein 1879—1955] ঐ ভাষণে প্রমাণ করতে চাওয়া হয়েছিল, আলোর গতি পথ জড়বস্তুর টানে বেঁকে যেতে পারে। পরদিন ৭ নভেম্বর কাগজগুলো বলেছিল—বিজ্ঞানের নতুন সত্য। নিউটনের দীর্ঘদিনের তত্ত্ব বাতিল। সঙ্গে সঙ্গে স্বীকৃতি। কোন একটা সময় যতটুকু জানা যায় ততটুকুই জ্ঞান। প্রতিনিয়তই নতুন তথ্য পুরানো ধারণা ভেঙ্গে দেয়। বিজ্ঞানে নতুন তত্ত্ব পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করা যায় বলে তাকে যত সহজে লোক মেনে নেয় দর্শনে তা হয় না। বিশেষ করে সমাজদর্শনের ক্ষেত্রে।

যার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই মানুষের কাছে তা কখনো চলতে পারেনা। ভাববাদ যে দীর্ঘকাল চলল, এখনো বহুমানুষ তার প্রভাবে প্রভাবিত, তার দ্বারা এটাই বুঝায় এর একটা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আজ আর বিশ্বাস নির্ভর একটা সমাজ-জীবন চলতে পারেনা। কেননা, যুক্তির আলোকে জীবন হয়ে উঠেছে বিজ্ঞান ভিত্তিক। তবুও, ভাববাদীরা পূর্ব বিশ্বাসে অবিচল থাকতে চায়। বিতর্ক তাই বহমান। বিতর্কের বিষয়টা এই রকম ঃ—'সমাজের জন্য শিল্প' না 'শিল্পের জন্য শিল্প'? স্রষ্টা সচেতনভাবে না মগ্নচৈতণ্যে সৃষ্টি করে? যারা শিল্পীর সমাজ-দায় স্বীকার করে তারা বস্তুবাদী। আর শিল্প-শিল্পের জন্য যাদের আদর্শ তারা ভাববাদী।

পাখী গান গায় আপন আনন্দে। মানুষ তা শুনে মোহিত হয়। তেমনি শিল্পী শিল্প সৃষ্টি করবে আপন আনন্দে মনের মাধুরী মিশিয়ে বিভোর হয়ে। সামাজিক মানুষের বাসনালোকে তা দেবে আনন্দ-

দোলা। কথাটা মন্দ নয়। যদিও নয় যুক্তিগ্রাহ্য। পাখী—ধরা যাক কোকিল। তার কুহুতান কত কবিকে প্রণোদিত করে সৃষ্টির আনন্দে। কিন্তু কোকিল কি ডাকার জন্যই ডাকে? কেন সে বসন্তেই ডাকে! বসন্ত কোকিলের সঙ্গমের মাস। প্রয়োজনেই কোকিল-কণ্ঠ মুখর হয়। শিল্পীরও থাকে প্রয়োজন। যেমন বলেছেন শরৎচন্দ্র—

"সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছু, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলেনা, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না, সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই, —এদের কাছেও কি ঋণ আমার কম? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে, তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার, কত দেখেছি কুবিচার, কত দেখেছি নির্বিচারের দুঃসহ সুবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদেরই নিয়ে। সংসারে সৌন্দর্যে সম্পদে ভরা বসন্ত আসে জানি; আনে সঙ্গে তার কোকিলের গান, আনে প্রস্ফুটিত মল্লিকা-মালতী-জাতি-যূথি, আনে গন্ধ-ব্যাকুল দক্ষিণা পবন; কিন্তু যে আবেষ্টনে দৃষ্টি আমার আবদ্ধ রয়ে গেলে, তার ভিতর ওরা দেখা দিলে না। ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটলো না।। সে দারিদ্র্য আমার লেখার মধ্যে চাইলেই চোখে পড়ে।"

[৫৭তম জন্মদিনে প্রতিভাষণ]।

শরৎচন্দ্রের প্রয়োজন এই অবহেলিতদের হয়ে কিছু বলার। যারা নিজেদের বস্তুবাদী বলেন না তারাও, সৃষ্টির মধ্যে একটা উদ্দেশ্য খুঁজে পান। 'ভাবকে নিজের করিয়া অপরের করার নাম সাহিত্য বা ললিত কলা'—বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। আর আশুতোষের মতে, 'সাহিত্য জাতীয়তা গঠনের অন্যতম উপায়'। [স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ১৮৬৪—১৯২৪] অপর পক্ষে ম্যাথু আর্নল্ড বিশ্বাস করেন—'সাহিত্য জীবনের সমালোচনা'। [Matthew Arnold,

1822-1888] দেখা যাচ্ছে সকলেই উদ্দেশ্যবান, উদ্দেশ্যহীন নন কেউই। কেউ চাইছেন নিজের একটা ভাব থাকবে। সাহিত্যের মাধ্যমে ওটা অন্যের মনে সঞ্চারিত করতে হবে। কেউ আপত্তি করবেন না। কিন্তু আপত্তি হবে যদি বলা হয়—বস্তুবাদের ভাবধারা সঞ্চারের দায়ভাগ নেবে সাহিত্যিক। তখনি তা হবে প্রচারপত্র। দ্বিতীয়জন চেয়েছেন, সাহিত্যের দ্বারা জাতি গঠন করতে। সাহিত্য একাজটা সব যুগেই করেছে। কিন্তু তা "প্রচার" হয় নি! তৃতীয়জন তো স্পষ্টই বলছেন, জীবনের সমালোচনার দায় সাহিত্যের।

কোন জীবনের সমালোচনা! লক্ষ্যটা কী? প্রশ্ন করে বস্তুবাদী। জাতিগঠন হোক তবে তা যেন সাম্প্রদায়িক না হয়। অথবা তা যেন না হয় জাতির বিত্তবান অংশের জয়গান। বিত্তহীনের মুক্তির জয়গানে মুখরিত হোক জাতিগঠন। শোষণমুক্ত জাতিগঠনের কাজে নেমে পড়ুক সাহিত্যিক। আপন ভাব অপরের মধ্যে সঞ্চার করা কিছু মাত্র দোষের নয়। শোষকের কানে সঞ্চার করা হোকনা শোষিতের বেদনা! দাসব্যবসায়ীর লোভী মনের সমালোচনা হোক। লেখা হোক আঙ্কলস্ টম'স কেবিন। অথবা 'মা' কিংবা 'রথের রশি' লেখা হোক।

পটভূমি যদি হয় "প্রগতি লেখক সংঘ" তবে আলোচনা আরো সহজ হয়। প্রতিষ্ঠার সময় প্রগতি লেখক সংঘ ছিল একটি যৌথ সংস্থা। এতে সমভাবে সামিল হয়েছিল ভাববাদী এবং বস্তুবাদী লেখক শিল্পীরা। পরীক্ষা সফল হল না। এক সঙ্গে চলা যায় নি। ভাববাদীদের অভিযোগ ছিল—বস্তুবাদীরা অপরের বিশ্বাসে বাধা দিচ্ছে। এবং এও বলা হতো যে, বস্তুবাদীরা তাদের মতবাদ প্রচারে নেমেছে। প্রচার কখনো সাহিত্য হতে পারে না। প্রচার যে সাহিত্য নয়, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যদিও বিপরীতক্রমে এটা সত্য যে সাহিত্য প্রচারই। সাহিত্য জাতীয়তা গঠনের জন্য ব্যবহৃত হয়। আবার নিজের ভাব প্রচার না করলে, অপরের হয় কী করে?

বিশ্বাস, আপন মতবাদে বিশ্বাস চাই-ই চাই। বস্তুবাদীর অসুবিধাটা এই যে সে আপন মতবাদটা সঠিক বলে জানে। আর তাই সত্যের প্রতি অবিচল না থাকলে ভাবের ঘরে চুরি করতে হয়। আর বস্তুবাদ যে যুক্তিভিত্তিক একটা বৈজ্ঞানিক মতবাদ তার কিছু পরিচয় দেওয়া যাক।

এককালে বস্তুবাদী হলেও এখন সমরেশ বসু আর বস্তুবাদী নন। এটা তিনি নিজেই বলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরও কিছু বলেন। তার চিত্ত শুদ্ধি প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন,—"কিন্তু এ-কথাও অকপটেই স্বীকার করা উচিত, কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসার পরেই, আমার চারপাশের জগৎ ও মানুষ সম্পর্কে দৃষ্টি সজাগ হয়। আমার অভিজ্ঞতার প্রসার ঘটে। আমার নিজের দারিদ্র্য ও দুঃখী মানুষদের সম্পর্কে, এক আত্মিক চেতনা গড়ে তোলে। আমার ভেতর জাগিয়ে তোলে সর্বস্ব ত্যাগের প্রেরণা।"

বস্তুবাদে যার বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে—চারপাশের জগৎ ও মানুষ সম্পর্কে তার দৃষ্টি সজাগ হয়। অভিজ্ঞতাব প্রসার ঘটে আর দরিদ্র ও দুঃখী মানুষের প্রতি মমতা বোধ বাড়ে। স্রষ্টার কাছে এসব খুবই জরুরী বিষয় আর সৃষ্টির অপরিহার্য শর্ত। এই শর্ত প্রতিপালনে বস্তুবাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ঔপন্যাসিক সমরেশ বসুর স্বীকৃতি থেকে তা জানা গেল।

ভাববাদীর পক্ষে বস্তুবাদীর এই মানস গঠন অনুভববেদ্য নয়। এই প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ ডঃ অশোক মিত্রের এক সাক্ষাৎকারের একটি অংশ তুলে দিতে চাইছি। "মার্কসবাদ আমার কাছে এক সঙ্গে, স্বপ্ন, দর্শন, জীবনবোধ। সুতরাং আমাদের পৃথিবীতে মার্কসবাদের ব্যবহারিক প্রয়োগে যে বিভিন্ন সমস্যা, সেগুলি দুটো দিক থেকে দেখতে চাই। এমনকি পৃথিবীর কোনও দেশে যদি সাধারণ মানুষের বেঁচে ওঠার আন্দোলন সফল নাও হত, তাহলেও মার্কসীয় দর্শন বেঁচে থাকতো। মানুষকে শুভ থেকে শুভতর, ভালো থেকে ভালোতর হওয়ার প্রেরণা হিসাবে।"

বস্তুবাদীর আছে বিশ্বাসের জোর। তার পরিমাপে ভাববাদী থৈ পায় না। এটা তার কল্পনার সীমার মধ্যে নেই। বস্তুবাদী, ভাববাদীর কাছে তাই প্রহেলিকা। ফলে সে অভিযোগ করে - বস্তুবাদী গোঁড়া-নীতি সর্বস্ব বলে। এই অভিযোগ থেকেই 'প্রগতি লেখক সংঘ' ভেঙ্গে যায় বা ভাববাদীরা তা থেকে বেড়িয়ে যায়। বিদ্বেষ নয়, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে ওঁরা এ ভুলটা করতেন না। এই প্রসঙ্গে ই. এম. এস নাম্বুদ্রিপাদের একটি বক্তব্য উল্লেখ করা যায়।

"মার্কস, এঙ্গেলস ও লেলিন তাদের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্বের ভিত্তিতে শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁদের ধ্যান-ধারণার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেবার সময় খুব অল্পই পেয়েছিলেন। অবশ্য, কোন কোন লেখকও তাদের লেখা সম্পর্কে যে সামান্য তুই একটি উক্তি করেছেন, তাতে স্পষ্ট হয়, যে তারা সাহিত্যে ভাবগত এবং বস্তুগতের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করতেন। তুটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। মার্কস ও এঙ্গেলস বালজাকের লেখার বিপ্লবী বিষয়বস্তুর অত্যন্ত মূল্য দিতেন, তার প্রতিবিপ্লবী ধ্যানধারণার অনুরাগ সত্ত্বেও। লেনিন রুশ লেখক তলস্তয়ের প্রশংসা করতেন ও বলতেন তার লেখা রুশ বিপ্লবের দর্শন। যদিও ভাবগত দিক থেকে তলস্তয় প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শের অনুসরণকারী ছিলেন।

ভারতীয় ভাষার লেখকদেরও পর্যালোচনা করলে, আমরা বহু দৃষ্টান্ত পাব।"

দেখা যায় লেখকরা অনেক সময়েই নিজেদের স্থির আদর্শের মধ্যে ধরে রাখতে পারেন না। এটা ঘটে মূলতঃ ভাববাদীর মধ্যে। সম্ভবতঃ বাস্তবতার সংঘাত তার কল্পনার জগৎকে ভেঙ্গে দেয়। এটা অসহনীয় ভাববাদীর কাছে। ভাববাদী লেখক সংঘাত এড়াতে হার মানে! ফলে ভাববাদীদের মধ্যে ভাববাদ ও বস্তুবাদের উপাদানের দ্বন্দ্ব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। এটা বস্তুবাদীদের ক্ষেত্রে ঘটেই না। ভাববাদীরা এতে বিস্মিত হন। মনে করেন লেখক বুঝি তার স্বাধীনতা হারিয়েছে। আসলে তীব্র বিশ্বাসটাই যে স্বাধীনতা, অন্তত বস্তু-

বাদীর কাছে, এটা ওরা বোঝেন না। আদর্শের কাছে ওদের দায় কম। লেখার কাছে দায়টা বেশী। তবুও, ভাববাদীরাও বাস্তব জীবনের কথা বলেন এবং তা বহু সময় বস্তুবাদ সম্মতও। দেখা যায় ভাবের টানে অনেক লেখক বস্তুবাদী হয়ে উঠেছেন যদিও তাঁরা বস্তু-বাদী শিবিরের লোক নন। সম্ভবতঃ 'বস্তুর' টানে 'ভাব' তার দরকারী জায়গাটুকু হারিয়ে ফেলেছে। বিস্ময়করভাবে সফলও কেউ কেউ।

আকাশ-কুসুম হতে পারে না সাহিত্যের বিষয়। বাস্তব জীবনকে নিয়ে বাস্তব জীবনের কাছে পৌঁছানই তার ইচ্ছা। কিন্তু সবসময় সব লেখক এটা পারেন না। কখনো কখনো নিজ সমাজের অবস্থান থেকে শোষিতের কথা বলাও অভিজ্ঞতায় ধরা দেয় না। ভয়ও পায় এঁরা কখনো কখনো। তবু লেখক যদি বাস্তবের কারবারী হন তাকে শোষিতের কথা বলতেই হবে, ওটাই জীবন। এ-প্রসঙ্গেও ই. এম. এস নাম্বুদ্রিপাদের বক্তব্যই আমাদের বক্তব্য সমর্থন করবে।

"সুতরাং প্রশ্ন জাগে, আসান ও ভল্লাথোন কি লিখেছিলেন সমাজের জন্য? স্বাভাবিক উত্তর হবে, না। যেমন প্রথম জীবনের লেখাগুলি হয়েছে প্রাচীন গতানুগতিক ধাঁচে তেমনি পরবর্তীকালের লেখাগুলিতে তাঁরা যে সমাজের মানুষ ছিলেন, সেই সমাজের ধ্যান-ধারণায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাই প্রকাশের জন্য তাদের লেখক প্রতিভা ব্যবহার করেছিলেন। যে নব্য ধ্যানধারণা তারা প্রকাশ করেছিলেন, তা তাঁদের ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা ছিল না, ছিল সমাজের ধ্যান-ধারণা। সমাজ তাঁদের মাধ্যমে এই ধ্যান-ধারণাগুলি প্রকাশ করেছিল।"

সমাজের ধ্যান ধারণার সামাজিক চেতনামণ্ডিত প্রকাশ বস্তুবাদীর উদ্দেশ্য এবং একমাত্র কাম্য-কর্ম। ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা প্রকাশ ভাববাদীর লক্ষণ। ভাববাদী সমাজ সচেতন হলে সমাজ তার কথা ভাববাদীকে দিয়ে বহু সময় বলিয়ে নেয়। এটা হলে, অবচেতন ভাবে বস্তুবাদের প্রকাশ ঘটে। যেটা ই. এম. এস দেখেছেন আসান

ও ভাল্লাথোনের লেখায়। মার্কস এঙ্গেলস পেয়েছিলেন এটা বালজাকের মধ্যে। অপরপক্ষে এটাই ঘটেছিল তলস্তয়ে। যেটা স্বীকৃতি পেয়েছে লেনিনের কাছে।

বাংলা ভাষায় বস্তুবাদী সাহিত্যের বিকাশের প্রথম পর্বে আছে ভাববাদী কিংবা বাস্তববাদী সাহিত্যের প্রভাব। সমাজ কিংবা রাজনীতির মত ইসাহিত্যেও দেখা যাবে ত্রিস্তর মণ্ডিত অভিব্যক্তি। বিবর্তনের স্তরগুলি সমাজ কিংবা রাজনীতিতে যেমন, তেমনিভাবে প্রতিফলিত হয় সাহিত্যেও। সাহিত্যেও পাওয়া যায় আদি যুগ, মধ্য যুগ এবং বস্তুবাদী যুগ—এই ত্রিস্তর সমন্বিত বিকাশ। লোককথা, গাথা, পল্লীগীতি এসবের মধ্যে আদি যুগের সাহিত্য ভাবনা বিকশিত হয়েছে। স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টির কাল এটা। মধ্যম স্তরে চেতনা এসেছে স্রষ্টার মনে, কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বাস প্রশ্নাতীত। এটা তাই ভাববাদীদের কাল। এরপর এলো বস্তুবাদ। মধ্যযুগেও সাধারণ মানুষ সাহিত্যে এসেছে। কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী এবং তির্যক ভাবে। বস্তুবাদী সাহিত্যেই সাধারণ মানুষ এলো উজ্জ্বলরূপে। স্বমহিমায়, বলদৃপ্ত এবং ঐশ্বর্যশালী মূর্তি ধরে।

তবুও প্রশ্ন, সন্দেহ এবং আক্রমণ রইল অব্যাহত। বস্তুবাদ গ্রহণে প্রবল আপত্তি ভাববাদীদের। প্রথমেই ওঁরা বললেন ঈশ্বরকেন্দ্রী জগৎ যে নীতিবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, তা অস্বীকার করলে সমাজ-বন্ধন শিথিল হয়ে পড়বে, সমাজে দেখা দেবে অরাজকতা। নীতিবোধ বস্তুবাদেও আছে। ভাববাদীরা বলেন বস্তুবাদের কোন নৈতিক ভিত্তি নেই। ফলে, বস্তুবাদে বিশ্বাসী সাহিত্যিক তার সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে কোন নৈতিক মান উপস্থিত করতে পারেন না। জীবন হয় বন্ধনহীন এবং কিছুটা লক্ষ্যহীন। বস্তুবাদী নৈতিকতা এ-ভাবে বিচার করা হলে তা হবে একেবারেই একপেশে। বস্তুবাদীর নীতিবোধ কোন দৈবীপ্রভাবে তো স্থির হয় না। সেটা স্থির হয় বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা। বস্তুবাদীর কাছে নীতি হলো শোষিতের পাশে দাঁড়ান। তার লক্ষ্য হলো শোষণের অবসান। এবং আদর্শ হলো সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা। এর মধ্যে কোন পারম্পর্যহীনতা নেই। যুক্তিহীন

আনুগত্য দাবী করেনা বস্তুবাদীর বৈজ্ঞানিক নৈতিকতা। বস্তুবাদীর কাছে সমাজতান্ত্রিক নীতি প্রতিষ্ঠাই তার নৈতিকতা।

বস্তুবাদী সাহিত্যিককে আরও যে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, তা হলো, প্রথমতঃ—বস্তুবাদী সাহিত্য বিজ্ঞাপন বিশেষ—কেননা এটা প্রচার। দ্বিতীয়তঃ—বস্তুবাদী সাহিত্যিকের ব্যক্তি স্বাধীনতা নেই। ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাহিত্য হলো—"জাতীয়তা গঠনের অন্যতম উপায়"। কিন্তু, এখানেও কী স্রষ্টার দায় নেই প্রচারের। সে কি স্বাধীন? মানুষ তো সেই কবে থেকে সমাজ রক্ষার প্রতিশ্রুতিতে দায়বদ্ধ। সেতো আপন প্রতিশ্রুতির কাছে বন্দী। জন্মের ছাড়পত্র হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশু নিজ অজ্ঞাতসারেই যে প্রতিশ্রুতি দেয় সমাজকে—তাকে লালন করার বিনিময়ে, তা সে ভাঙতে পারে? সমাজ ভাঙতে দেয়? কে কী ভাবে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে, বিচার্য সেটাই। কেননা ব্যক্তিকে, নিজের 'ভাবকে' তো 'অপরের' করাতেই হবে। না-হলে সাহিত্যই হবে না। অপরের মানেতো সামাজিকের চাহিদা আর প্রয়োজনই হ'ল শেষ কথা। মায়াময় শব্দের মোহজাল বিস্তার করে ভাববাদী তার উদ্দেশ্যটা প্রচ্ছন্ন রাখে। বস্তুবাদ যেহেতু বিজ্ঞান, তাই তার আড়াল নেই। বিজ্ঞানীর কাছে সত্যকে আড়াল করা তো আত্মহত্যারই নামান্তর। সে তা পারেই না। স্রষ্টা তাই জানে—জানতে তাকে হয়,

> "ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোটো সে তরী
> আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।"

রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, এ তরী নিরবধি বহমান, সংসার ঘাট থেকে ঘাটে ছুটে চলেছে। ব্যক্তির দায় ফসল তুলে দেওয়া, নিজেকে তোলা নয়। বস্তুবাদীর কাছে কর্ম প্রধান, কিন্তু ভাববাদীর কাছে ব্যক্তিপ্রধান। এঙ্গেলসের এই ব্যাখ্যায় বক্তব্য প্রস্ফুটনে সহায়ক হবে—"দাঁন্তে ও সারভ্যানটিসও কম যান না, এবং শিলারের 'প্রেম ও অবৈধ প্রণয়' সম্পর্কে সব চেয়েভালো যা বলা যায় তা হলো, জার্মানির রাজনৈতিক সমস্যামূলক নাটকের প্রথম পথিকৃত আধুনিক রুশীয়

ও নরওয়েজীয়ানরা সুন্দর উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন, সকলেই একটা উদ্দেশ্য নিয়ে লিখেছেন।" সাহিত্যে বস্তুবাদী চিন্তার প্রয়োগ মোটেই প্রচার নয়। বস্তুবাদীরা মনে করে সাহিত্যের নিজস্ব একটা উদ্দেশ্য আছে। সেটাই তাকে সাহিত্যিক করে। লেখকের প্রকৃতি হলো তার উদ্দেশ্য। ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য একটা মাধ্যম বেছে নেয়। প্রবন্ধে সেটা কম-বেশী সকলেই পারে। কিন্তু সাহিত্যে পারে কেবলমাত্র স্রষ্টা।

কিছু কিছু শব্দ নিয়ে আলোচনা করলেই দেখা যাবে ভাববাদী আর বস্তুবাদীর বৈপরীত্য। "পবিত্র" বলতে ভাববাদী এর অনুসঙ্গে দেখতে পায় পরাচেতনা। যা ব্যাখ্যার অতীত। কিন্তু বস্তুবাদী মনে কর,—"যদি 'পবিত্র' বলে কিছু থাকে, তাহলে আমি বলব, মানুষের নিজের প্রতি অসন্তোষ, নিজের অস্তিত্ব থেকে সমৃদ্ধিলাভ করার প্রচেষ্টা, একেই আমি 'পবিত্র' বলে গণ্য করি, এছাড়াও, আমি পবিত্র বলে গণ্য করি, তার নিজের দ্বারা সৃষ্ট জীবনব্যাপী ক্লেদস্তূপের প্রতি তার ঘৃণাকে, পৃথিবী থেকে ঈর্ষা, লোভ, অপরাধ, রোগ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও মানুষে মানুষে শত্রুতা দূরীকরণে তার ইচ্ছা ও তার শ্রমকে।"

—ম্যাক্সিম গোর্কি।

চিন্তন ক্রিয়া ন্যায়শাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। অন্য কারণে সাহিত্যিকের কাছেও এটি সমান আকর্ষনীয়। কেন চিন্তা এবং কিসের চিন্তা? যেহেতু আমি স্রষ্টা তাই চিন্তাটা হলো সৃষ্টির লক্ষ্যের চিন্তা। আর লক্ষ্যকে কেন্দ্রীভূত করেই স্রষ্টা পায় একটি ভাব। ভাবটুকু ভাষায় প্রকাশ করতে হবে। ভাববাদী তার লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত করতে পাবে পরাবস্তুতে। কিন্তু বস্তুবাদীর ক্ষেত্রে তা হতে পারে না। তাকে বাস্তব জীবন-জগৎ থেকেই 'ভাব' পেতে হবে। যেহেতু তার লক্ষ্য শোষিতের মুক্তি। শোষণের অবসান।

ভাবটা আসে চিন্তণ ক্রিয়া অর্থাৎ 'কল্পনার' মধ্য দিয়ে। ভাববাদী তার কল্পনার লাগাম ছুটিয়ে দিতে পারে তেপান্তরের মাঠে

এটা পরাবাস্তবও হতে পারে। কিন্তু বস্তুবাদীর কাছে 'কল্পনা' কখনো বিমূর্ত হতেই পারেনা।

"কল্পনা" যদি হেতুবাক্য হয় তো 'জ্ঞান' হলো সিদ্ধান্ত বাক্য। ন্যায়শাস্ত্রে বলা হয়েছে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়র উপস্থিতি তুলনা এবং তার সাম্য সম্বন্ধে একটা প্রতীতি। এই যে তুলনা করা, বিচার করা এটা হবে বাস্তব। বাস্তবের প্রয়োজনেই 'কল্পনা' হেতুবাক্যরূপে আসতে পারে, অন্যভাবে নয়। মানবীয় গুণারোপই হবে কল্পনার একমাত্র ক্ষেত্র।

আঙ্গিক-সাহিত্যের-প্রেক্ষিতে এটা হবে ভাষার মাধ্যমে একটি মূর্ত বস্তু কিংবা কল্পনার বাস্তব রূপ পরিগ্রহণ। এমন একটা প্রতিরূপ আনতে হবে যার মধ্যে ভাব হবে প্রবাহিত। কল্পনা যেন সহচর হয় আর উদ্দেশ্য থাকে স্থির।

সাহিত্য কাকে নাড়া দেবে? হৃদয় না মস্তিস্ক! তত্ত্বের দিকটা বুদ্ধিকেই স্পন্দিত করবে। কিন্তু সাহিত্যের দিকটা হৃদয়ের ধন। কেবল যদি এ-বিচার করা হয় যে, লেখাটা পুরোপুরি তত্ত্বের প্রতিরূপ হলো কি হলোনা, তবে, ভুল হবে। বিষয়টি খুবই বিতর্কিত। এঙ্গেলস বলছেন—

"আমার মনে হয় পরিস্থিতি ও ঘটনার মধ্য দিয়েই সরাসরি উল্লিখিত না হয়ে, সমস্যার সমাধান প্রকট হওয়া উচিত এবং লেখক তাঁর বিবৃত সামাজিক সংঘাতের ভবিষ্যৎ ইতিহাসগত সমাধান সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠকের কাছে পরিবেশন করতে বাধ্য নয়।" লেনিন বিশ্বাস করতেন, কী করতে হবে তা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাহিত্যকই ঠিক করবে। তিনি তাই গোর্কিকে লিখেছেন,—"লেখার শিল্প-সংক্রান্ত ব্যাপারে আপনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক।" সাহিত্যের স্বরূপ প্রসঙ্গে প্লেখানভের বক্তব্য প্রণিধান যোগ্য। সাহিত্যের স্বরূপ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "মানবীয় আদান প্রদানের উপায়।" স্মরণীয়, সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কথা—'ভাবকে নিজের করিয়া অপরের করার নাম সাহিত্য বা ললিত কলা।" প্রশ্ন হলো, এটা হবে কী ভাবে?

এই প্রসঙ্গে মাও সে তুং-এর একটি বক্তব্য উল্লেখ করে তারপর করা হবে অভিনবগুপ্তের 'রস' তত্ত্ব পর্যালোচনা।

"শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির উৎস হচ্ছে জনগণের সামাজিক জীবন। মতবাদগত রূপ হিসাবে শিল্প-সাহিত্যের রচনার উৎপত্তি হয় মানুষের মগজে, কোন বিশেষ সমাজের জীবনের প্রতিফলন হয় তাই থেকে। তেমনি বিপ্লবী শিল্পসাহিত্যের রচনার উৎপত্তি হয় বিপ্লবী শিল্পী ও সাহিত্যিকদের মগজে জনগণের জীবনের যে প্রতিফলন হয় তাই থেকে। জনগণের জীবনে শিল্প ও সাহিত্যের কাঁচামাল সব সময়েই থাকে অজস্র পরিমাণে, থাকে স্বাভাবিক ও অমার্জিত অবস্থায়, কিন্তু এই সব মালমসলাই হচ্ছে সবচেয়ে প্রাণবন্ত, মূল্যবান ও মৌলিক। তারসঙ্গে তুলনা করলে সমস্ত শিল্প ও সাহিত্য নিস্প্রভ মনে হয়। এইসব মাল-মসলাই শিল্প-সাহিত্যের অফুরন্ত উৎস। একমাত্র উৎস, তার আর কোন উৎস নাই অতীতের শিল্প সাহিত্য একই উৎসকে কাজে লাগিয়েছিল, এবং তা বর্তমানের রচনার জন্য উৎস নয় স্রোতমাত্র। আমরা প্রাচীন শিল্পসাহিত্যের মধ্যে কল্যাণকর যা' পাব তাই গ্রহণ করব। বিদেশী রচনার মধ্যে থেকে উৎকৃষ্ট ও কল্যাণকর অংশগুলো আহরণ করতে আমাদের আপত্তির কারণ নাই।"

মাও আরো বলেছেন, "মানুষের সামাজিক জীবন যখন এত সুন্দর, সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত, তখন আবার মানুষ তাই নিয়েই সন্তুষ্ট না থেকে শিল্প-সাহিত্যও চায় কেন? চায় এইজন্য যে, শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে প্রতিফলিত জীবনকে প্রকৃত দৈনন্দিন জীবনের চেয়ে আরো উন্নত, নিবিড়, কেন্দ্রীভূত ও নিখুঁত আদর্শের আরো নিকট এবং আরো সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলা যায় ও করা উচিত। সেজন্য প্রয়োজন বিপ্লবী শিল্প ও সাহিত্যে বাস্তব জীবন থেকে বিভিন্ন ধরণের চরিত্র সৃষ্টি করে জনগণকে তাদের ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে যাবার কাজে সাহায্য করা।"

বস্তুবাদীও সাহিত্যকে 'প্রচার' হতে দিতে চায়না। সে চায়

বাস্তব জীবনকে। যদিও তা হবে আরো পূর্ণ। তাতে শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রকাশও হতে হবে।

সৃষ্টির উৎসে থাকবে "সামাজিক জীবন।" 'মানসে' এই সমাজ-জীবনের প্রতিফলন হবে। সাহিত্যের উপাদান অবশ্যই থাকে সমাজে,—কিন্তু তা 'স্বাভাবিক' হলেও থাকে 'অমার্জিত অবস্থায়'। অতীতের 'সাহিত্য' বর্তমানের উৎসময় স্রোত মাত্র। গ্রহণযোগ্য হলো "কল্যাণকর" উৎসগুলো। সাহিত্য-শিল্পের আদৌ কোন প্রয়োজন আছে কিনা? মাও বলছেন, প্রতিফলিত জীবনকে আরো উন্নত, নিবিড়, কেন্দ্রীভূত ও নিখুঁত করে তোলা যায় বলে সাহিত্য-শিল্পের অবশ্যই প্রয়োজন আছে। বস্তুবাদী সাহিত্য বা সুকুমার কলার স্বরূপ নির্ণয়ে আর কোন বিতর্ক থাকা উচিত নয়। তবু শেষ কথাটি বলা যাচ্ছেনা। প্লেখানভের ঐ 'আদান-প্রদান' এবং রবীন্দ্রনাথের 'নিজের করিয়া অপরের করা' তত্ত্বের জন্য। এটা কীভাবে হবে? মাও বলছেন সাহিত্য দেখাবে উন্নততর জীবন। জীবনটা উন্নততর হলো যে,...এটা কীভাবে বোঝা যাবে? আদান-প্রদান উভয়তঃ প্রক্রিয়া। লেখক পরিবেশক সে দেবে। পাঠক ভোক্তা সে নেবে। পরিবেশনা এবং গ্রহণযোগ্যতার শর্ত কী?

আমরা প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে কল্যাণকর যা পাব তাই গ্রহণ করবো। গ্রহণযোগ্যতা সম্বন্ধে প্রাচীনেরা কী বলেন? 'ধ্বনি' দিয়ে পাঠক ভোলান যায় না। 'রীতি' কিংবা অলঙ্কার সাহিত্যকে পাঠকের কাছে গ্রহণীয় করায় অপরিহার্য পদ্ধতি নয়। সামাজিকের বাসনালোকের বিগলন সম্ভব, সার্থক রস নিষ্পত্তিতে। বস্তুবাদী সাহিত্যকেও এ-দায় বহন করতে হবে। বাক্যে রস নয়, শব্দের চাতুরী নয়—নয় কেবল-মাত্র বলার কৌশল, সাহিত্যের মানদণ্ড। সাহিত্য তার সার্থকতা পায় যখন তা পাঠক গ্রহণ করে। গ্রহণের শর্ত এই বাসনার বিগলন সৃষ্টির সার্থকতার জন্য এই প্রাচীন মানদণ্ডটি আমরা গ্রহণ করছি। এবার আমরা সরাসরি বস্তুবাদী সাহিত্যের উৎস ও বিকাশের পরিচয় দিতে পারব।

বাংলা সাহিত্যের আদি যুগ

১৯১৬ খ্রীঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী [১৮৫৩-১৯৩১] মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়, 'হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামক গ্রন্থ। এর মধ্যে 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়' অংশের সাড়ে ছেচল্লিশটি পদকেই স্বীকার করা হয় বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম পদ বা কবিতা বলে। আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় [১৮৯০-১৯৫৩] এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম অহিন্দু ছাত্র যিনি বেদ পাঠের অধিকার পান এবং অনার্সে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম হন, সেই মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব [১৮৮৫-১৯৫৩] চর্যার রচনাকাল নির্দিষ্ট করেছেন দশম থেকে দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দে। হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের যুগে এবং মুসলমান শাসনের সময় বৌদ্ধগণ নেপালে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ বাঙালী বৌদ্ধেরা এই গ্রন্থটি সে-সময় নেপালে নিয়ে যান। শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল থেকেই এটি আবিষ্কার করেন।

বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব কালে আমাদের যা স্মরণীয় তা হলো, বাংলা সাহিত্যের প্রথম বইটি ধর্মীয় বাতাবরণে রচিত এবং নেপালে প্রাপ্ত। ভাবা অসঙ্গত হবেনা যে, বৌদ্ধেরা সমাজে থাকতে পারছিল না। কেননা, তাঁরা ছিলেন অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্ণের বা শ্রেণীর। তাদের ধর্ম গ্রন্থ অনুন্নত শ্রেণীর ভাষা পালি-প্রাকৃততে রচিত। আর এই প্রাকৃতের একটা বিভাগ থেকেই উঠে এসেছে বাংলা ভাষা।

সাহিত্য সৃষ্টির জন্য চাই সমাজবদ্ধ মানব জীবন। তাদের চিন্তা-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সুখ দুঃখই হলো সাহিত্যের উপকরণ। এসবই প্রভাবিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয় সমসাময়িক রাজনৈতিক মতাদর্শের দ্বারা। রাজনৈতিক প্রভাব এবং ভাষা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে বিকশিত হয়। বাংলা ভাষার আধার যে ভৌগোলিক অঞ্চল তার উল্লেখ পাওয়া যায় আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতেও। একে গৌড়ও বলা হত। গৌড় না বঙ্গ এ বিতর্কে আমাদের প্রয়োজন

নেই। গৌড় যারা শাসন করতেন তাদের একটু পরিচয় নেওয়া যাক।

মোটামুটি ধরা হয় খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকেই গৌড় ছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে। সপ্তদশ শতকে গৌড়েশ্বর বলে পরিচিত শশাঙ্ক (নরেন্দ্র গুপ্ত) সম্ভবতঃ বাঙালী ছিলেন না। যদিও তিনি গৌড় সংলগ্ন অনেক অঞ্চল দখল করে স্বাধীন ভাবেই গৌড় শাসন করতেন। গুপ্ত সাম্রাজ্য বিরোধীতার কাল এটা।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাঙালী যে অরাজক সমাজ জীবন যাপন করে,—ইতিহাসে তা উল্লিখিত হয় মাৎস্যন্যায় নামে। কম করেও একশত বৎসরের বেশী [খ্রীঃ ৬৩৭ থেকে ৭৫০ খ্রী] সময় চলেছিল এই অরাজকতা। একশত বৎসরের অরাজকতা যে জাতি মেনে নেয় তাকে দক্ষ প্রশাসক কিছুতেই বলা যাবে না। এর পর এলো পাল যুগ।

অনেকেই মনে করেন পাল যুগ হলো 'গণতান্ত্রিক' ব্যবস্থার যুগ। কেননা, এটাও অনুমান করা হয় যে, বপ্যটপুত্র গোপালকে সিংহাসনে বসায় জনসাধারণ। আসলে জনতার নামে কাজটা করেছিল সামন্ত প্রধানরাই। তাই, এ যুগ হলো সামন্তযুগ। সময়সীমা—অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। আমাদের এবারও একটা সন্দেহ নিয়ে থাকতে হচ্ছে। পালেরাও সম্ভবতঃ বাঙালী ছিলেন না। যদিও এরা শশাঙ্কের মত বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন না। একারণেই এটা মনে রাখা দরকার, চর্যাকার বৌদ্ধরা নেপালে আশ্রয় নিয়েছিলেন নিরাপত্তার কারণে। এদের সময়েই কৈবর্ত (বরেন্দ্র) এবং ঢেককরীতে ঈশ্বরী ঘোষ (মঙ্গলকাব্যের ইছাই ঘোষ) বিদ্রোহ করেন।

এর পর এলেন সেন বংশ। এরা দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত গৌড়শাসন করেন। নিঃসংশয়ে বলা যায় সেনেরা বাঙালী ছিলেন না। এরা ছিলেন কর্ণাটকীয়। আজও বাঙালী ধর্মীয় জীবনে যে দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণ অধিক সমাদৃত তার মূলে আছেন এই সেনেরা। কুলীন প্রথার মূলেও আছেন এই সেনেরাই। বাঙালীর সমাজ বিন্যাস—হিন্দু

বাঙালীর, এখনও যা বহতা, তার রূপরেখা গড়ে দেন এই সেন বংশ।

এতদিন যারা বাংলা শাসন করছিলেন, তারা বাঙালী না হলেও ভারতীয় ছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তাও রইল না। শাসকরূপে পাই ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কী মুসলমান ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন বখ্‌তিয়ার খিলজীকে। ইনি লক্ষ্মণসেনের কাছ থেকে গৌড় [নবদ্বীপ] দখল করেন। শুরু হলো ইসলাম জীবন-দর্শন প্রভাবিত মুসলমান শাসন। তুর্কী বিজয় প্রমাণ করে সমাজের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বৈদিক জীবন-চর্চ্চা কিছুমাত্র প্রভাব বিস্তার করেনি। বৈদিক তথা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ছিল উচ্চ বর্ণের মধ্যে প্রচলিত। তারাই ছিল সমাজের স্বচ্ছল শ্রেণী। অপরপক্ষে বৌদ্ধ-সম্প্রদায় [ধর্মান্তরিত] ছিল সাধারণ শ্রেণীর মানুষ। এদের সঙ্গে এবার এলো ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি। সংঘাত ও সমন্বয়ের নতুন যুগ। ইসলাম শুধু দেশ জয়ই করল না। সে জয় করল সাধারণ মানুষের হৃদয়ও। ইসলামের সাম্য-মৈত্রীর বার্তা ঝড় বইয়ে দিল জনসমুদ্রে। এই ত্রিমুখী দ্বন্দ্বে বৌদ্ধেরা প্রায় হারিয়ে গেল। উচ্চ দর্শন, জীবন-জিজ্ঞাসা এবং সংস্কৃতির প্রভাবে সমাজের শিখরবাসীরা, হিন্দু জীবন চর্চ্চা আরো গভীরভাবে গ্রহণীয় মনে করলো। অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে ক্রমেই প্রভাব বিস্তার করছিল ইসলাম।

দেখা যাচ্ছে গৌড়-জন পর শাসনেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। হয়ত এ-কারণেই সমাজ কখনোই থিতু হচ্ছে না। চলছে অবিরাম সংঘাত। বিক্ষোভ প্রবণ বাঙালী মন এইভাবেই কেন্দ্রবিরোধী, প্রশাসন বিমুখ হয়ে উঠেছে। যা কিছু গড়ার তা করছে পরবাসী। মানুষ বিক্ষোভে উত্তাল অথবা হাত গুটিয়ে ভাবছে সুখ দেবে পরকাল। নিখিল-ভারতের কেন্দ্র শক্তির চরম উপেক্ষা এই গৌড়ের প্রতি। সেই কবেকার বেদের যুগ। তখন সে 'বয়াংসি'। [কিচির-মিচির শব্দ করা পাখীজাতীয় মানুষ আর কি] বাঙালীর ভাষা-মাতা মাগধী-প্রাকৃত। সংস্কৃত লেখকগণ তাকে ব্যবহার করেন জেলে ধোপাদের মুখে। তখন রাজ ভাষা ছিল মারাঠী-প্রাকৃত। রাণীর বুলি শৌরসেনী

প্রাকৃত। অন্ত্যজ শ্রেণীর ভাষা মাগধী-প্রাকৃত। এর কোনটিই বাঙালীর জবান নয়। কোন রাজ-তনয় কি রাজপুরুষকে শাস্তি দিতে হলে বাঙলায় পাঠান হয়। যেমন, এখন হয় আন্দামানে। এখনও তো এই ধারাই বহমান।

এই ঐতিহ্য আর পরিবেশের মধ্যে বিবর্তিত হতে থাকল 'আ মরি বাঙলী ভাষা।' লেখকরা ছিলেন সাধারণজন। তারা তাই রাজ মনোরঞ্জনের জন্য কাব্য-রচনা করলেও অজ্ঞাত সারেই বলতেন আপন-জনের দুঃখ যন্ত্রণার কথা। হয়ত তখন তা প্রতিবাদের ভাষার দাপট পায়নি। কিন্তু বিলাপের হৃদয় বিদীর্ণ করা আর্তনাদ তাতেও শ্রুত হত। যিনি প্রথম ঐরকম একটি চরণ রচনা করেছিলেন তিনিই প্রথম বস্তুবাদী সাহিত্যের ধারা প্রবর্তন করলেন বাংলা সাহিত্যে। সেই চরণের প্রথম শ্রোতা কিংবা পাঠক বাংলা সাহিত্যে বস্তুবাদী ধারার প্রথম পাঠক। এ-সব নিশ্চয় পরিকল্পিত কোন কিছু ছিল না। সর্বত্র না হলেও সাধারণভাবে এটা অক্ষমের চরম হতাশার অভিব্যক্তি।

আদি যুগ : প্রচ্ছন্ন বাস্তব

শূন্যপুরাণ কিংবা আগমপুরাণ নাম যাই হোক তার বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অন্ততঃ ১২শ বছর আগে লেখা হয়েছিল এই কাহিনী। সেটা ইসলামের বিজয়ের যুগ। বিজয়ী ইসলাম এবং মুসলমান সম্প্রদায় তখনো ভারতীয় হয়ে উঠেনি। অথচ শূন্যপুরাণে তাদের বর্ণনা করা হলো রক্ষকরূপে!

'ব্রহ্মা হইল মহম্মদ বিষ্ণু হইল পগাম্বর
আদম হইল শূলপাণি।
গণেশ হইল কাজী কার্তিক হইল গাজী
ফকির হইল যত মুণি'।

বোঝা যায় লেখক ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল নন। ব্রহ্মা মহম্মদ অভেদ কল্পনা মুসলিম ধর্মানুমোদিত নয়। তবু সে তা বলছে! যাদের বলা হয় ব্রাত্য কিংবা অন্ত্যজ যদিও এদের সঠিক পরিচয় হলো শোষিত বলে, তারা স্ব-সমাজে নিরাপত্তা না পেয়েই এটা করছে! ইসলাম বিজয়ী। ইসলাম বিদেশী তবুও তার কাছেই নিরাপত্তা খোঁজে যে সমাজের মানুষ, সেই সমাজের শ্রেণী বিভেদ কোথায় পৌঁছেছিল! ধর্মের কারণে নয়, আত্মবিশ্বাসের অভাবটাই বিবেচ্য। স্ব-সমাজে বিভেদ জাতির জাতীর আত্মবিশ্বাস এবং মর্যাদাবোধ নষ্ট করে দেয়। সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, ধ্রুপদী-কলা সৃষ্টির তাগিদটাই আর থাকেনা। আতঙ্কজনক এই মানসিকতা। এই মানসিকতা ১৭৫৭-এ পলাশীর প্রান্তরে হাহাকারে পর্যবসিত হয়।

কিছুই নেই কিংবা হয়নি এটা বলবো না। এও বলা হঠকারী হবে যে, সবই শূন্য। আবার এই বিভাজন, শোষক এবং শোষিতের মধ্যে, অনুল্লিখিত থাকাও সত্যের অপলাপ হবে।

বাঙালীর ইতিহাস যে, ধূসর, অস্পষ্ট এবং ছায়াঘেরা এত অনস্বীকার্য। কে বাঙালী? প্রাগার্য নর-গোষ্ঠী না আর্য-মানুষেরা,

নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় আর ভোট-চীন—এদের সকলেই বাঙালী না কেউ কেউ। সাংস্কৃতিক বা নৃতাত্ত্বিক বিভাগ ছেড়ে অন্যভাবে দেখা যাক। নিষাদ, কোল, ভীল, মুণ্ডা এবং সাঁওতাল এরা সকলেই বাঙালী। নাকি কোন কোন সম্প্রদায় বা কোন একটি সম্প্রদায় মাত্র বাঙালী? ধর্মের দিক থেকে কী কোন বিভাগ হতে পারে?

মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ কিংবা লোকায়ত দেব দেবী যেমন নাগ-ভজনকারীদের মধ্যে কে বাঙালী, স্থাপত্য, শিল্প এবং সঙ্গীতের জগতে বাঙালীর নিজস্ব পরিচয় কী? কোনটি? বাঙালীর কাছে রামায়ণ-মহাভারতও অবিকৃত থাকে না, অনুবাদের সময় সে কিছু পাল্টে নিয়েছে। গঠন নয় ভাঙ্গার কাজেই যেন বাঙালীর সায় থাকে। এখনো দেখি বিক্ষোভ কর্মসূচীতে লোক আনা যায় কত সহজে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে কোন কাজের কর্মসূচীতে ক'জনইবা যোগ দেয়!

এই পটভূমিতে চলেছে বাঙালীর সাহিত্য সাধনা। এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে বাঙালী বিস্ময়কর মনীষার পরিচয় দিয়েছে। পাথরের দুর্গ গড়তে সে পারেনি, কিন্তু ভাষা-মর্মরের প্রাসাদ রচনায় দেখিয়েছে নিপুণ মুন্সীয়ানা। এই একটি ক্ষেত্রে ধর্ম চেতনা, গোষ্ঠী চেতনা ভুলতে পেরেছে বাঙালী। মুসলমান সুলতানগণও উৎসাহ দিয়েছেন, পৃষ্ঠ-পোষকতা করেছেন, রামায়ণ-মহাভারত অনুবাদে সমাজ-জীবনে আছে আন্দোলন প্রবনতা। কিন্তু সাহিত্য হলো সৃষ্টি। সে চায় গড়তে। লেখকের কাছে বাঙালীর জীবন তাই লক্ষ্য বস্তু হয়ে উঠতে দীর্ঘ সময় নিয়েছে। সেটা কীভাবে কতটা ঘটলো চর্যাপদে? চর্যাপদ থেকেই বাঙালী তার সাহিত্য-যাত্রা শুরু করে।

সন্দেহ নেই, বৌদ্ধমতে বিশ্বাসী ধর্মপ্রাণ কবিরা সাধন কথাই প্রকাশ করেছেন কাব্যরূপের আড়ালে চর্যাপদে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সঙ্গত কারণেই একে বলেছেন, 'আলো-আঁধারি ভাষা'। পদকারগণও ছিলেন ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ। ভুললে চলবেনা সর্বোপরি তারা কবি ছিলেন। আর কবিরা হলেন প্রজাপতি। সৃষ্টির তাগিদে তারা

ধর্মকথা এবং দুঃখগাথা একাকার করে সেই অস্থির সমাজের শোষিত মানুষের হাহাকারও প্রকাশ করেছেন।

ধর্মচার সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ বাস্তব জীবনমুখীতার একটি লক্ষণ। হাজার বছর আগেও ধর্ম-পথ-যাত্রী কেহ কেহ সে সন্দেহ থেকে একেবারেই সরে থাকতে পারেনি। শিষ্য আনন্দ গুরু বুদ্ধের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন, বোধি লাভ করার পর কী হবে? চর্যাপদ কর্তাও প্রশ্ন করেন,—

মাহের বান চিহ্ন রূপ না জানী
সো কইসে আগম বেত্রঁ বখানী।

এরপর পদকর্তা একটা নির্দেশ দেন,

অপনে অপা বুঝত নিঅমন।

অর্থটা এইরকম– জানা যায় না যা কেমন করে তার ব্যাখ্যা করবে আগম আর বেদ? তুমি নিজেই মনদ্বারা নিজেকে বুঝ। এর মধ্যে আত্মবিশ্বাসের একটা প্রচ্ছন্ন প্রকাশ দেখা যায়। প্রবাদ বা প্রবাদ প্রতিমতা সাহিত্যে স্থায়ী সম্পদ। চর্যায়ও তা আছে। "কালে সংবোহিঅ তুইসা" বাক্যটির অর্থ হলো, কালা বোঝায় বোবাকে। "অপনা মাংসে হরিণা বৈরী।" এর অর্থ নিজের মাংসই হরিণের শত্রু। চর্যায় স্থান পেয়েছে অন্ত্যজ শ্রেণী। ডোমদের কথা, তুলো ধোনার প্রসঙ্গ কিংবা তাঁতিদের কথা আছে চর্যায়। বাস্তবতা আছে, যদিও বস্তুবাদের কবিতা নয় চর্যা। স্বাভাবিক।

বস্তুবাদী হতে হলে বস্তুবাদে বিশ্বাস অপরিহার্য শর্ত। চর্যা রচনার প্রায় হাজার বছর পর বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের সূত্রগুলি পাওয়া গেছে। তাই সচেতনভাবে না হলেও বস্তুবাদীর চোখ দিয়ে চর্যাকারেরা সমাজের দিকে তাকিয়েছে। যারা আছে সবার পিছে এবং নীচে তারা চর্যায় উপেক্ষিত হয়নি, হাজার বছর হাঁটার পরও বাংলা সাহিত্যের প্রথম পদযাত্রীকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করি তাদের এই ইতিবাচক অর্থবহ দৃষ্টির জন্য। বিস্ময়কর অর্থবহ এই শুরু। চর্যার স্রষ্টারা বাস্তুহারা, পলায়মান। ধর্মীয় জিহাদ ঘোষিত হয়েছে এদের বিরুদ্ধে। বৌদ্ধগণ

অন্ততঃ এই পূর্বাঞ্চলে ছিলেন অন্ত্যজ শ্রেণীর। তাদের ধর্মগ্রন্থেও গ্রাহ্য হয়েছিল সাধারণের ভাষা—পালি-প্রাকৃত। সংস্কৃতভাষা ও হিন্দু উচ্চবর্ণের মানুষ সমার্থক হয়ে উঠেছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠেছিল রাজ-কাহিনী অথবা নর-নারীর প্রেম। ধর্মীয় কাহিনীও প্রেমের বাতাবরণে বিতরিত হতো।

বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের যুগ তখনো বহুদূর। চর্যায় বস্তুবাদের সচেতন প্রকাশ আমরা পাব না। কিন্তু পাব বস্তুবাদের উপাদান। শোষিত মানুষের জীবন-কথা। সমাজের কথা আবার এসে পড়ে। যে ভৌগোলিক অঞ্চলকে আমরা বলি বাঙলা তার আদিজন হলো—রাজবংশী, সাঁওতাল, কোল, ভিল. এবং ডোম ইত্যাদি। তাদের শিকড় প্রোথিত মাটির গভীরে। তারা, আমরা দেখেছি, শাসনের রজ্জুটা ছুঁতে পারেনি। যারা ছিলেন শাসক, তার উত্তরাপথের। উত্তরাপথের স্বীকৃতিই ছিল তাদের কাম্য। যদিও ঐ অঞ্চলে তারা উপেক্ষিত। উত্তরাপথের দিকে তাকিয়ে বঙ্গ শাসন বাঙালীর কাছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রকমফের। ভাস্কর্য, স্থাপত্য, তৈলচিত্র, ধ্রুপদী সাহিত্য ও সঙ্গীত প্রসারে রাজানুকুল্য অথবা ধর্মানুকুল্য অপরিহার্য তাতেও। তা পায়নি বাঙালী। উত্তরাপথমুখী শাসকের অবহেলায়, উদাসীনতায় বাঙলায় এসবের বিকাশ তাই উল্লেখযোগ্য নয়।

বিপরীত ক্রমে কবিতা এবং কথা সাহিত্য হলো গণ-সাহিত্য। যেহেতু এতে রাজানুকুল্য তেমন প্রয়োজন হয় না, তাই সাহিত্যের বিকাশ হয়েছে বাঙালীর জীবনে বিস্ময়কর। গণ-সাহিত্য বিশেষ করে প্রতিবাদী সাহিত্যের স্বীকৃতি দেয় পাঠক। তাদের প্রধান অংশই সাধারণ মানুষ। এদের কথা বাংলা সাহিত্যে অকপট এবং প্রধান। বাঙালীও অন্য শিল্পে তেমন সুবিধা করতে না পেরে পুরো দরদটাই ঢেলে দিয়েছে সাহিত্যে। বাঙলা সাহিত্য তাই এমন ফল-ভারাক্রান্ত। সাহিত্যে বাঙালী অপরাজেয়। এবং অন্যত্র ব্যর্থতার প্রতিশোধ নিয়েছে এই সাহিত্যে।

অষ্টম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত রাজত্ব করেছিল প্রথমে পাল ও

পরে সেনবংশ। এরপর ইসলামী শাসনের যুগ। ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। অস্থিরতার কাল এটা—যদিও তমসাচ্ছন্ন যুগ। হুসেন শাহ্ সুলতান পদে অভিষিক্ত হন ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি বাঙলা ও বাঙালীকে আপন করে নিয়েছিলেন। ইসলামী সংস্কৃতির সঙ্গে স্থানীয় সংস্কৃতির মেল বন্ধন ঘটান। সাহিত্যের ইতিহাসে সে পরিচয় আমরা পাব। এর সঙ্গে উল্লিখিত হতে পারে চৈতন্য-কথা। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য জন্মে ছিলেন নবদ্বীপে। [১৪৮৬ – ১৫৩৩ খ্রীঃ]

১২০৩ খ্রীঃ ইখতিয়ারউদ্দিন বক্তিয়ার খিলজী নদিয়া জয় করেন। একে একে বাঙলা শাসন করলো,—পাঠান, খিলজী, বলবন, মামলুক আর হাবসী সুলতানেরা। এরা ছিল বিদেশী। স্থানীয় মানুষের সঙ্গে অবিশ্বাসের সম্পর্ক অস্বাভাবিক ছিলনা। বিজয়ীর চণ্ডনীতি বিজেতাকে বারেবারে দিশাহারা করেছে। ইসলামী সংস্কৃতি এবং তখন তা শাসকেরও ধর্ম, গভীর প্রভাব বিস্তার করছে হিন্দু সমাজে, বিশেষ করেই নিম্ন বর্ণের মধ্যে। ইসলামী সাম্যের বাণী অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে সমাজ, ধর্ম এবং স্বীয় প্রভার রক্ষার আকুল প্রয়াস। এই বিপর্যয়ের মধ্যেও প্রেম-সাহিত্য রচনা বিরাম ছিল না। বাংলায় এবং বাঙালীর দ্বারা সংস্কৃতে। প্রেম চিত্ররূপে তার মূল্য কম নয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ আর তার সামাজিক জীবন-চিত্র কোথায়? বৈষ্ণব কাব্যে নয়, সে চিত্র আছে মঙ্গলকাব্যে।

মঙ্গলকাব্যে বিশ্লেষণের আগেই আমরা রামায়ণ-মহাভারত নিয়ে দু একটি কথা বলে নিতে চাই। ধর্ম-কেন্দ্রী বৈদিক সংস্কৃতির প্রভাব ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত বাঙলায়ও প্রভূত। ঐ সংস্কৃতির মধ্যে আছে রাজ ঐশ্বর্যের সঙ্গে বৈরাগ্যের এক সমন্বয় প্রচেষ্টা। সাধারণ মানুষ, সাধারণের জীবন সেখানে তেমন করে এলো কোথায়। এতো নিত্য দিনের হাসি-কান্নার জীবন নয়। এ জীবনে বিস্ময় আছে, নৈকট্য নেই। সাহিত্যের চরিত্রের সঙ্গে বাস্তব মানুষের নৈকট্য আছে মঙ্গলকাব্যে। আছে কিছু গানে এবং লোক-কথায়।

মঙ্গলকাব্যের শুরু হয়েছিল পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে। আর

প্রায় থেমে যায় এই ধারা অষ্টাদশ শতকের অন্তে এসে। মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত হত দেব-কাহিনী। যার বয়নে থাকত পৌরাণিক কিংবা লৌকিক কথা অথবা এর একটা সমাহার। বিশেষ সম্প্রদায়ের দেব-দেবীর পূজা প্রচারই ছিল এ-কাহিনীর উদ্দেশ্য। কাহিনীগুলো জনতার সামনে গীত হত অভিনয়ের আঙ্গিকে। এক মঙ্গলবারে শুরু হয়ে নাকি পরের মঙ্গলবারে শেষ হত। তাই হয়ত এই নাম। আবার 'মঙ্গল রাগে' গীত হত বলে অথবা সকলের মঙ্গলার্থে গীত হত বলেও হয়ত এই নাম প্রচলিত হয়।

ধর্মের আবরণেই রচিত হত এ-কাহিনী। কিন্তু দেবমহিমা ছাপিয়ে এতে প্রাধান্য পেত আর্যেতর মনুষ্য সম্প্রদায়ের গার্হস্থ্য জীবনের মর্মন্তুদ চিত্র। হরির কথাই তো বলা হয়েছিল যখন কবি বলেন,—

শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই।

কিন্তু কবিতাটি পরিচিত হয়ে রইল মানুষের রণধ্বনির কাব্য হিসেবে। মানুষ এখন দেবতাকে তার সঙ্গে সঙ্গেই রাখতে চাইছে। এই স্পর্ধাই তাকে জীবন-যুদ্ধে সাহস দিচ্ছিল এবং যুদ্ধজয়ের প্রেরণা দিচ্ছিল।

সর্প-দেবী মনসা এবং ব্যাধের-দেবী চণ্ডী। আসলে আর্য সংস্কৃতির চাপে শোষিত অনার্য সম্প্রদায়ের আপন সংস্কৃতি রক্ষার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাই ব্রত, ছড়া আর মঙ্গলকাব্যের বিষয় বস্তু। এতে সাম গান নেই। নেই ঋজু কঠিন শব্দ, কিন্তু তুলনাহীন ছন্দ-মাধুর্যে ভরা মনমুগ্ধকর ভাষা। কিন্তু আছে আপন সংস্কৃতি রক্ষায় যোদ্ধার দার্ঢ্য আর কঠিন জীবন। যুদ্ধ শেষে কোন পক্ষই বোধ হয় পরাজিত নন। সংস্কৃতির মিলন ঘটল। মনসা-মঙ্গল এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যেমন দৃষ্টান্ত হয়ে আছে বিশ্বামিত্রের সাধনার দ্বারা ব্রাহ্মণ হওয়ার কাহিনী। আর একালে বিবেকানন্দকে ধর্মীয় আর্যরূপে গ্রহণ এই ধারারই সর্বশেষ সংযোজন। শ্রেণী সমাহার।

সাপের দেবী মনসা মহাদেবের কন্যা এবং জরুৎকারু ঋষির পত্নী। ভগিনী বাসুকী। চণ্ডী তো শিবেরই পত্নী! ধর্মঠাকুর লোক দেবতা। এই 'লোকেরা' প্রাক-আর্য সমাজের শোষিত শ্রেণী। যদিও কল্পনা করা হয় ধর্মঠাকুরকে কখনো শিব, কখনো বিষ্ণু, আবার কখনো বুদ্ধ অবতার রূপে।

এই সকল কাহিনীতে থাকে, স্বর্গের কোন দেবতা মর্ত্যে পূজা চান। সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গে কারো না কারো উপরে বর্ষিত হয় অভিশাপ। কোন দেবকুমার কিংবা নর্তকী মর্ত্য মাতার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করলেন। যদি তারা তাদের স্বর্গের পূর্ব জীবন ভুলে গিয়ে থাকে তো স্বর্গ থেকে দেবতা স্বপ্ন দেখাবেন। এরপর ছলে বলে কৌশলে শুরু হবে পূজা প্রচারের চেষ্টা। একে আমরা এইভাবে ভাবতে পারি : স্বর্গ হলো আর্য সমাজ। তারা চাইছে মর্তধামে আদি এবং শোষিত সমাজে স্বীকৃতি। স্বর্গ সমাজের কাউকেই একাজে নিয়োগ করা হলো। সে শোষিত সমাজে মিলেমিশে কাজটি করতে চায়। না পারলে— স্বপ্ন মানে নির্দেশ আসে। শাসনও করা হয় সাধ্যমত। যেমন চাঁদ সদাগরের নৌকা ডুবিয়ে দেওয়া। সবশেষে দেওয়া নেওয়ার মাধ্যমে সমাজ থিতু হয়। এই সংস্কৃতি সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বৈদিক আর্য সংস্কৃতি বিস্ময়কর শোষণ শক্তির পরিচয় দিয়েছে। যেটা অন্য কোন সংস্কৃতি পারে নি। এরকম সংঘাতের নিষ্পত্তি সাধারণতঃ জয় পরাজয়ের মাধ্যমেই হয়।

লোককথা, এবং ব্রত কথার মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে সাধারণ মানুষের জীবন কথা। লোক মুখে প্রচারিত হতে হতে তার কাহিনী পাল্টে যায় আঞ্চলিক পরিমণ্ডলে। কোন একসময় শক্তিশালী লেখক তা লিপিবদ্ধ করেন। এই ভাবেই উদ্ভব হয় মহাকাব্যের। রামায়ণ মহাভারতে আমরা এটা প্রত্যক্ষ করি। মঙ্গলকাব্য ও এই শ্রেণীভুক্ত। সাধারণ বাঙালী, তার সমাজ ও জীবনের মহাকাব্য এই মঙ্গলকাব্য। একাধিক লেখক এই কাহিনী উপজীব্য করে মঙ্গলকাব্য রচনা করেছেন। ফলে, ব্যবহারে ব্যবহারে মঙ্গলকাব্যে এসেছে কিছুটা

চাকচিক্য এবং কিছুটা বা পরিশীলিত মননের প্রতিফলন। অথচ, কোন অবস্থাতেই হারিয়ে যায়নি সাধারণ মানুষের জীবন চিত্র এবং সেই সময়ের সমাজ। সাধারণ মানুষের সীমাহীন শোষণ-বঞ্চনা-দুঃখের হাহাকার বিলম্বিত লয়ে বেজেই চলে এই কাব্যে। এতে বার বার উচ্চারিত হয়েছে প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধ! আপামর সাধারণ মানুষ এটা যেন ভাগ্য বলে মেনে নিয়েছে। স্থানান্তরে তারা ছুটে চলেছে সৌভাগ্যের অন্বেষণে। ভাগ্যজয়ের শোভাযাত্রাই মঙ্গলকাব্যের প্রবহমানতা। যদিও জনতা কোথাও ফুঁসে উঠে রুখে দাঁড়ায় না।। শোষককে খুঁজে ফেরে না। তাই এই মহাযাত্রা কিন্তু বিপ্লব যাত্রা নয়। তখনও শোষিতের সংগঠন গড়ে উঠে নি। সেখানে "শিশু কাঁদে ওদনের তরে"। বাৎসল্য আর বিড়ম্বনা—বাঙালীর চিরদিনের জীবন চিত্র।

মঙ্গলকাব্য যুগে যুগে বিবর্তিত হয়েছে। প্রতি যুগেই নতুন নতুন কবি নতুন নতুন সমাজ ব্যবস্থার রূপ দেখেছেন এবং বলেছেন। মনসা-মঙ্গলের অন্যতম প্রধান কবি বিজয়গুপ্তের লেখায় আমরা তার সমর্থন পাই।

"মূর্খে রচিল গীত না-জানে মাহাত্ম্য
প্রথমে রচিল গীত কানা হরি দত্ত।
হরি দত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে।
যোড়া গাথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে॥"

এর পাশাপাশি পাই সাধারণ বাঙালী নারীর নিরাপত্তাহীনতার চিরকরুণ চিত্র। সেই পরিচিত কাহিনী। স্বামীর স্ত্রী ত্যাগ! স্বামী জরৎকারু স্ত্রী মনসাকে ত্যাগ করলে, মনসা বলছে,—

"জনম দুঃখিনী আমি দুঃখে গেল কাল।
যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল॥
শীতল ভাবিয়া যদি পাষাণ লই কোলে।
পাষাণ আগুন হয় মোর কর্ম ফলে॥

মনসামঙ্গল কাহিনীর নায়ক সে যেই হোন না কেন, লক্ষ্মীন্দর

একাহিনীর অন্যতম প্রাণপুরুষ ! তাকে বাঁচাতে পিতা চাঁদ সদাগর লোহার বাসর গড়ে ছিলেন। অথচ মৃত পুত্রের জন্য তার প্রতিক্রিয়া কোথায় ? স্বামীহীন শ্বশুরবাড়ী এখনও স্ত্রীদের কাছে দুঃস্বপ্নপুরী। আর তা যদি হয় প্রথম যৌবনে তবে, 'সতী' হয়ে এখনো তাকে আত্মরক্ষা করতে হয় ! স্বামী লক্ষ্মীন্দরের মৃতদেহ নিয়ে স্ত্রী বেহুলা কলার ভেলায় ভেসে চলেছে অজানা পথে। সংকল্প একটাই— স্বামীকে সে বাঁচিয়ে তুলবে। এর ধর্মীয় ব্যাখ্যা যাই থাক সামাজিক কারণ একটাই। স্বামীর অবর্তমানে শ্বশুরের ভিটার স্ত্রীদের কোন স্থান নেই। নেই কোন সহায়। অকূল সাগরের বুকে ভেলা ভাসিয়ে আকুল বিলাপের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়, বেহুলার নিরাপত্তাহীন জীবনের চিত্র।

জাগ প্রভু কালিন্দী নিশাচরে।
ঘুচাও কপট নিদ্রা ভাসি সাগরে॥
প্রভুরে তুমি আমি দুইজন।
জানে তবে সর্বজন॥
তুমি তো আমার প্রভু আমি যে তোমার।
মড়া প্রভু নহ রে তুমি গলার হার॥

মনসামঙ্গলে দেখা যায় বৈদিক আর্য সভ্যতার সঙ্গে লোকায়ত এবং সাধারণ বাঙালী জীবনের একটা মিশ্রন প্রক্রিয়া এবং তারই সংঘাত। চণ্ডীমঙ্গলে এই প্রভাবটা বরং বৌদ্ধসংস্কৃতির সঙ্গে যদিও বৈদিক আর্য সংস্কৃতি অনুপস্থিত নয়। মনসামঙ্গলের কাহিনী সরল কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলের কবিরা সাধারণভাবে দুটি কাহিনী অবলম্বন করে ঘটনা বর্ণনা করেন। এ দুটী হলো যথাক্রমে 'আক্ষেটিক' ও 'বণিক খণ্ড'। আক্ষেটিক খণ্ডে আছে কালকেতুর কথা আর বণিকখণ্ডে ধনপতি এবং শ্রীমন্ত সদাগরের গল্প।

ব্যাধের ঘরে জন্ম নিল ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর ও তার পত্নী ছায়া। মনুষ্য জন্মে তাদের নাম হলো কালকেতু ও ফুল্লরা। সম্ভবতঃ সে সময় বহিরাগত শাসকশ্রেণী তথা দেবতাগণ প্রয়োজনবোধ করেছিলেন

স্থানীয় মানুষের সঙ্গে একটা সমঝোতা করার। তাই, আমন্ত্রণের অপেক্ষা না করে দেবরাজপুত্র নিজেই ব্যাধের ঘরে ঢুকে পড়লেন। আর ব্যাধ প্রধান কালকেতু দেবীর প্রসাদে গুজরাট নগর পত্তন করে ফেললেন। মানিক বন্দ্যোপাধায় লিখিত পদ্মানদীর মাঝিতে হুসেন মিঞা ও একটি জনপদ গড়ে তুলে ছিলেন। অর্থাৎ এই যে, কালকেতু কাজটা করেছে দেবীর প্রাসাদে, কিন্তু হুসেন মিঞা কাজটা নিজের শক্তিতেই করতে চেয়েছিল। সম্ভবতঃ বহিরাগত শক্তি স্থানীয় মানুষকে এটাই বোঝাতে চাইছিল যে, দেবতা বা বহিরাগতদের সাহায্যে তারা কত কিই না করতে পারে। অপরপক্ষে এটাও বলা হচ্ছিল যে, ব্যক্তির আপন ভাগ্য জয় করার শক্তি নেই। বিশেষ করে স্থানীয় মানুষের পক্ষে সেটা সম্ভবই না। আত্মবিশ্বাস ভেঙ্গে দেওয়ার এই প্রচেষ্টা শোষকশ্রেণী সমানে চালিয়ে চলছে — এই একালেও। যদিও তা আমাদের আলোচ্য নয় এই প্রসঙ্গে।

একটা লক্ষনীয় বৈপরীত্য আছে মনসামঙ্গলের সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গলের। মনসামঙ্গলে মনসা আপন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় নির্মম। দয়া, মায়া, স্নেহ কিংবা ভালোবাসার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই মনসার মধ্যে। শোষক কিংবা বহিরাগত বৈদিক আর্য সংস্কৃতি জোর করেই চাইছিল এই অঞ্চলের সংস্কৃতি গ্রাস করতে। সম্ভবতঃ বৌদ্ধপ্রভাবে চণ্ডীমঙ্গলে সংস্কৃতি গ্রাস না করে সমন্বয় করার একটা প্রবণতা দেখা যায়। শোষক কিছুটা নমনীয়। তার মধ্যে মনুষ্যচিত কিছু গুণ যেমন, স্নেহ-মমতাও লক্ষ্য করা যায় চণ্ডীমঙ্গলে। সর্বহারা, ক্ষুধার্ত, প্রশাসনহীন দিশেহারা স্থানীয় মানুষ তাতে কিছু কিছু সহযোগিতাও করে বৈকি। উচ্চশ্রেণীর প্রসাদ পেলেও সাধারণের জীবনে সুখ ছিল না। অস্থিরতা সমাজে সমানে চলছিল। তাকে দুটি উদরান্নের জন্য ছুটে যেতে হয় ভিটে মাটি ছেড়ে অন্য কোথা। মানা চলেনা দিনক্ষণ। 'ফুল্লরার বারমাস্যা' এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ক্ষুধা মানুষকে অন্ততঃ একটি কষ্ট থেকে মুক্তি দেয়। তা' হলো সংস্কারের জগদ্দল পাথর বহনের দায় থেকে মুক্তি। সুশীলা তার বারমাস্যায় বলে,—

"কাকেও না ছাড়ে বাসা কাল ভাদ্রমাসে।
হেন কালে যাইতে চাহ দূর পরদেশে॥"

স্বামী চায় সুশীলা দেশেই থাক। শুনেই সুশীলা বলে,—

"কিরূপে বঞ্চিমু মুঞি অভাগিনী নারী।
রান্ধিয়া যোগাইমু অন্ন নেঅ সঙ্গে করি॥"

মনসামঙ্গলের চাঁদসদাগরও শেষ পর্যন্ত মনসার পূজা দেয়। সকলের কাছেই যেন ভাগ্যটাই শেষ কথা হয়ে উঠে। কোথায় পুরুষকার? সাম্প্রতিক কালের বাঙ্গালী কবি পুরুষকার খোঁজে। বিষ্ণুদের 'ঘোড়সওয়ার' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বিস্ময়ে প্রশ্ন করতেই ভাগ্যজয়ের নেশায় কেউ মাতাল হলো না! অন্ততঃ একজন লেখকও সৃষ্টি করলেন না প্রতিবাদী সাহিত্য? ভাগ্যে এমন নিদারুণ বিশ্বাস কেন?

সাহিত্যের নামে, জীবনচর্চার নামে সৃষ্টি হলো প্রেমের নাম করে কামস্মৃত জীবন চিত্র। অথবা ভাগ্যাহত শোষিতের প্রসাদ প্রার্থনায় সীমাহীন শোভাযাত্রা। ভাগ্যহীনের এই যাত্রাপথে না আছে প্রতিবাদ, না আছে সাহিত্যে তার কোন সূত্রপাত। মঙ্গলকাব্য আমাদের সমাজ বিশ্লেষনের উপাদান দেয় সমাজচিত্র দেয়, কিন্তু ঋজু প্রতিবাদী কোন চরিত্র দেয়না। চাঁদসদাগরকে স্মরণে রেখেই এটা বলা যায়।

এই জড় জীবন প্রত্যাশিত ছিলনা। কেননা দারুণ প্রতিশ্রুতি ছিল চর্যাপদেই। চর্যাকার বলেন,

"এবং কার দিঢ় বাখোড় মোড়িউ।
বিবিহ বি আপক বন্ধেণ তোড়িউ।"

চলতি বাংলায় ভাবার্থ এই রকম,—

আমি ভেঙ্গেছি বাধার তোরণ
যত শৃঙ্খল বাধা করেছি হরণ।

কাব্যের এই ঝঙ্কার স্থায়ী হলোনা। ব্যক্তিজীবন চলেছে সেই ভাগ্যের হাত ধরে। স্বশাসনের কোন প্রচেষ্টা নেই আম জনতার।

সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও স্থাপত্য, কোথাও নেই প্রতিবাদের জয়-পতাকার উদ্যত দণ্ড। টিম টিমে হাটের আলোর দুঃখকথা কিছু কিছু লেখা হচ্ছে। প্রেমের বর্ণনাই তার চমৎকারিত্ব। প্রেম তো জীবনেরই অঙ্গ। প্রেম তো জীবনকে দেয় সঙ্গ। তাই বলে, 'সীতারাম' হলে দেশ চলে না। কোথাও গঠনমূলক কিছু দেখা যাচ্ছেনা।

১৫৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দ। বাঙলাদেশ এবার গেল মোঘল অধিকারে। উল্লেখ করতেই হচ্ছে, বাঙলার স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে পাঠানেরা। সেই মোঘল-পাঠান রণে, মরণ আলিঙ্গনে, বাঙালী দর্শকমাত্র। বাঙালী অবশ্য গ্রাম-দাওয়ায় মোঘল-পাঠান নামক খুঁটির খেলা খেলে সময় কাটাতে কসুর করল না। এখনও এই খেলা অবলুপ্ত হয়নি। আঞ্চলিক শাসকের সঙ্গে দিল্লীর প্রতিনিধি খাজনা আদায়কারীর লাগাতার লড়াই চলছে। বাঙালীর অবলম্বন সাহিত্য। এ-সময়ের সমাজ-চিত্র ধরা আছে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে। বর্ণনার বাস্তবতা এবং নিপুনতার জন্য কবি ঔপন্যাসিকের মর্যাদা পেয়েছেন।

এর সঙ্গে পেয়েছি পঞ্চদশ শতকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য। অষ্টাদশ শতকেও আমরা সুস্থির হতে পারিনি। ফলে পেয়েছি, 'কালিকা মঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য'। যে পুস্তক থেকে, লেখকের দাবি, কাত করলে রস গড়িয়ে পড়বে। মাঝখানে সপ্তদশ শতকে দেখলাম ধর্মঠাকুরের রমরমা। পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই ধারার পাশাপাশি বয়ে চলেছে বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রেম বিরহ-মিলন পর্যায়ে রস সাহিত্যের প্রবাহ।

সাহিত্য হলো বাঙালীর সেই বিজয়পতাকা যা হাতে করে সে উন্নতশির এবং স্পর্ধিত পদক্ষেপে বিশ্ব পরিক্রমা করতে পারে। সাহিত্যেই বাঙালীর নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার বিজয় বৈজন্তী লক্ষ্য করা যায়। বাঙালীর জীবনের সত্য, সুন্দর এবং স্থায়ী বনিয়াদ রচিত হয়েছে উনবিংশ শতকে তার ভাষা এবং সাহিত্য নির্ভর করে।

এর সঙ্গে আরো কিছু কিছু জিনিস এসেছে ঐ সাহিত্যের হাত ধরে। অনুবাদ এবং মৌলিক, দুদিক থেকেই এই সময় প্রবল সৃষ্টির স্রোত দুকূল প্লাবিত করেছে। সঙ্গে ছিল সংবাদ পত্র। তেজী আর স্বাধীন এবং দেশপ্রেমে উদ্বেল ও নিখিল বিশ্বচেতনায় বলীয়ান সংবাদপত্র। কী তার প্রভাব এবং প্রত্যয়! বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়।

এই নবজাগরণের প্রথম পুরোহিত রাজা রামমোহন রায়। [১৭৭৪-১৮৩৩] তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাম বলেছেন,……"আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই রামমোহন রায় স্বহস্তে যাহার সূত্রপাত করিয়া যান নাই।" রামমোহন বাঙ্গালী জাতি এবং বাংলা ভাষাকে বিতার্কিকের ভূমিকায় স্থাপন করেছিলেন। 'বিতার্কিত' শব্দটাই বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ছিল, আদিযুগের সঙ্গে মধ্যযুগের। একটি শব্দের মধ্যেই নিহিত আছে আধুনিকতার সম্ভাবনা। প্রাচীন সাহিত্যে বিতর্ক ছিলনা। ভালোমন্দের প্রশ্নটাই উঠেনি তখন। কোন লেখকই চাননি কারণ খুঁজতে। 'ওদন নেই শিশুর', চলো দেশান্তরে। কেন ওদন নেই এই প্রশ্নটাই ছিল অনুচ্চারিত। ওরা প্রশ্ন করতে জানত না। আদিযুগের সঙ্গে মধ্যযুগের তফাৎ হলো এই প্রশ্ন করা এবং প্রশ্নকর্তার সাহসের। এতদিন ছিল ভাগ্যে দৃঢ় বিশ্বাস এবং ঈশ্বরে আত্মসমর্পণে আস্থা। রামমোহন থেকে বিশ্বাসের বদলে যুক্তি এবং আত্মসমর্পণের স্থানে প্রশ্ন।

রামমোহন সাহিত্যের জন্য সাহিত্য করেন নি। সমাজ সংস্কার, বিশেষ করে ধর্মাচার সংস্কারের জন্যই প্রবন্ধ লেখেন। তিনি এভাবেই একটা প্রতিপক্ষও সৃষ্টি করেন। ফলে, বাদ,-প্রতিবাদ এবং পরিণাম—দ্বন্দ্ববাদের মূল বৈশিষ্ট্য রামমোহনের দ্বারাই প্রবর্তিত হয়। প্রতিবাদী ধারার সেই শুরু। রামমোহন বাংলাসাহিত্যে যুক্তিবাদী এবং প্রতিবাদী ধারার ভগীরথ।

বাঙ্গালীর নবজাগরণের প্রাণপুরুষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর [বন্দ্যোপাধ্যায়] মহাশয়। [১৮২০-১৮৯১] ত্রুটি হয়ত এই মহাপুরুষেরও ছিল। কেইবা ত্রুটিমুক্ত? সার্থক দর্শন সৃষ্টি এবং তার যথার্থ

প্রয়োগকে যদি আমরা মানব জীবনের পূর্ণতার মাপকাঠি ধরি, তবে বাঙ্গালী সমাজে বিদ্যাসাগর পূর্ণ মানবের উজ্জ্বলতম উদাহরণ। শিক্ষা বিস্তারের জন্য নিজেই তিনি প্রশাসক এবং শিক্ষক। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, তার রক্ষণ কাজে অক্লান্ত কর্মা এবং ছাত্রদের জন্য আদর্শ পাঠ্য পুস্তক রচনা-এমন কর্মঠ বাঙ্গালী খুব কম দেখা গেছে। ধর্মাচারে বিকারের যুগেও ধর্ম সম্বন্ধে তিনি ছিলেন নির্বিকার। শাসক-শোষককে প্রত্যাঘাতে অকুতোভয়! কুসংস্কার ভাঙ্গতে অদ্বিতীয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর পাঁচ বছর আগে 'দাস ক্যাপিটাল,' গ্রন্থ প্রকাশিত হয় [১৮৮৬]। তাঁর বয়স যখন আটাশ বছর, তখন কম্যুউনিস্ট ম্যানিফেষ্টো মুদ্রিত হয়েছিল। [জার্মান সংস্করণ-১৮৪৮] আমেরিকার শ্রমিক বিক্ষোভ, 'মে দিবস' বলে যার বিশ্বে পরিচয়,-তাও ঘটেছে এই মহাপুরুষের জীবৎকালে। এ-সব ঘটনায় কোন প্রতিক্রিয়া দেখান নি তিনি। যদিও, প্রথা ভেঙে সেই যুগেই সাহেব শিল্পীর সামনে নিজের মাকে বসিয়ে ছবি আঁকিয়ে নতুন প্রথা গড়েছেন তিনি। বংশদণ্ডের ভীতি উপেক্ষা করেও প্রথা ও বিধি ভেঙ্গে বিধবার বিবাহ দিয়ে নবপ্রথা ও বিধি গড়েছেন এই মহামানব বিদ্যাসাগরই। শাসকের মুখের উপর চটি পরা পা নাড়িয়ে প্রত্যাঘাতের সাহসও দেখিয়েছেন তিনি।

তবুও 'বিধবা বিবাহ' প্রসঙ্গে সমাজকে ধাক্কা দেওয়ার মত প্রতিবাদী সৃষ্টি তিনি করেন নি। রাজনীতিকে, ধর্মের মতই তিনি উপেক্ষা করে গেছেন। তবুও, তিনি ছিলেন একজন সচেতন মানুষ। তার অনুবাদের ভাষায় আছে সেই চেতনার তেজ। সে যুগের পটভূমিকায় এটাই একটা দারুণ ব্যাপার। বস্তুবাদী সাহিত্যের মধ্যে থাকে প্রতিবাদী দ্যোতনা। তার জন্য চাই 'যুক্তি' আর ভঙ্গি। বাংলা সাহিত্যের প্রতিবাদী যুক্তি আর ভঙ্গির শুরু রাজা রামমোহন রায় থেকে। প্রতিবাদ কোন না কোন বিষয় নির্ভর হয়। প্রতিবাদী বিষয়ের উপস্থাপনা ও তার প্রয়োগের শুরু বিদ্যাসাগর থেকে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পর থেকেই বস্তুবাদী সাহিত্যের গিরিখাত বাহিত প্রস্রবন-মুখ খুলে যায়।

এর আগে অবশ্য ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত [১৮১২-১৮৫৯] এসেছেন। না, রাজনীতি তিনিও করেন নি। কিন্তু করেছেন সমাজসেবা আর প্রকাশ করেছেন সংবাদপত্র। ১৮৩১ সালে প্রকাশিত হয় ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর'। দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এই পত্রিকাটি। প্রতিটি আধুনিক বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্তের আগ্রহ বিস্ময় উদ্রেক করে। সেকালের মাপে তিনি ছিলেন আধুনিক। সেকালে আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ দেশপ্রেম আর জাতীয়তাবোধ তাঁর মধ্যে পেয়েছি। সব চেয়ে যা বেশী করে পেয়েছি তা হলো নতুন নতুন বিষয়ের আমদানী রচনা ক্ষেত্রে। এখন আর সাহিত্য সৃষ্টির জন্য লেখককে বিষয় নির্ব্বাচনের স্বপ্ন দেখতে হয় না। নায়ক-নায়িকার নির্বাচনে প্রয়োজন হয়না, দেব-পুত্রকন্যাদের মর্ত্যে আনয়ন। ঈশ্বর গুপ্ত দেখালেন যে-কোন বিষয়ই কাব্যের বিষয় হতে পারে। এমন কি তপসে মাছও। তিনি 'বোতলবাসী' 'লালজল' নিয়ে 'বিলাতের' সভ্যতা কে উপহাস করেছেন। 'মাতৃসম মাতৃভাষাকে' বন্দনা করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে—

"মিছা মণি মুক্তা হেম স্বদেশের প্রিয় প্রেম
তার চেয়ে রত্ন নাহি আর"

তবুও বলবো রক্ষণশীল তিনি ছিলেন। বাংলাকেই দেখেছেন—শহুরে বাংলামাত্র। বিশ্ব তাঁর কাছে ভীষণ বড় কিছু।

দুদিক জ্বালিয়ে দেওয়া মোমবাতির সঙ্গেই তুলনীয় হতে পারে কবি মাইকেল মধুসূদনের জীবন [১৮২৪-১৮৭৩]। উপমা হিসেবে টাইফুনের কথাও ভাবা যেতে পারে। যদিও সমাজটাকে তেমন করে ধাক্কা তিনিও দিতে পারলেন না। গোমাংস ভক্ষণ করে কিংবা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে তিনি সমাজ-জীবনে বিতর্ক সৃষ্টি করেছিলেন মাত্র। তাঁর পাণ্ডিত্যও ছিল শ্রদ্ধা করার মত। কিন্তু কোন বিশেষ জীবন-দর্শন কিংবা নব সমাজ গঠনে চিন্তার কোন ছাপ তিনি জনমানসে ফেলতে পারেন নি। নিজেকে অমর করতে চেয়েছেন, পেরেওছেন। প্রশ্ন হয়তো করা যায়, কী দিলেন তিনি সামাজিককে ?

কোন কথাই বলেননি এবিষয়। তবুও মানতে হবে, ভাষা এবং ছন্দে তিনি নব-বাতাবরণ রচনা করেছিলেন। সিদ্ধরস সম্বন্ধে সংস্কার ভেঙ্গে নতুন বিবেকী যুক্তিবাদ এনেছিলেন। সব কিছুই নতুন করে দেখার ইচ্ছাটি জাগিয়ে দিলেন তিনিই। আঘাত করার সাহসও দেখালেন তিনি। "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" [১৮৬০] এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা' [১৮৬০] রচনা দুটির জন্য সামাজিক প্রহসন রচনার ক্ষেত্রে তিনি পথিকৃতের সম্মান পেতে পারেন, অবশ্যই। প্রহসন দুটীতে তিনি সমাজ জীবনের একটা কুৎসিত দিকের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তথাকথিত সভ্য এবং উচ্চ শ্রেণীর মানুষের পঙ্কিল জীবন কাহিনী তুলে ধরেছেন। সাহিত্য সৃজন করাই তাঁর কাম্য ছিল। তা তিনি পেরেছেন। তার প্রয়োজনেই এসব যেন হয়ে গেল। দেশের কথা—সাধারণ মানুষের শোষণের কথা তিনি ভেবেছেন কিনা জানিনা, তবে বলেননি। যদিও বস্তুবাদীরা তাঁর কাছে পেয়েছেন ঋজু মানসিকতা, সংস্কারহীন চিন্তা, সিদ্ধরস ভাঙ্গার সাহস এবং ছন্দে আধুনিকতা।

"নীলদর্পণ' লিখে কী আলোড়নটাই না এনেছিলেন দীনবন্ধু মিত্র [১৮২৯-৭৩] শোষকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শোষিতের বলিষ্ঠ পেশীর সার্থকতম প্রতিবাদের উজ্জ্বলতম চিত্র, এর আগে আর কোন লেখক এমন সার্থকভাবে চিত্রিত করতে পারেন নি। সেই প্রতিবাদ প্রতি-ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল, তামাম হিন্দুস্থানে। পরশাসনের মর্মন্তুদ যে-চিত্র তিনি এঁকেছেন তা স্বাজাত্য প্রীতি জাগিয়ে তুলতে সহায়তা করেছে। কিন্তু এওতো সেই ভাঙ্গারই আন্দোলন। ইংরেজ শাসন ভাঙো। এরও মূল্য আছে। বিশেষ করে পরাধীন দেশে। কিন্তু আমাদের বিবেচ্য গঠনমূলক কিছু। যার মানদণ্ডে সাহিত্য বিচার করা যায়। তা পেতে আমাদের আরও অপেক্ষা করতে হবে।

মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টি ও সাহিত্য সমালোচনা, উভয় বিভাগেই পারদর্শী ছিলেন সম্রাট সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র। নবীন চন্দ্র সেনের 'আত্মজীবনী' পাঠে আমরা জানতে পারি, সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র সমা-

লোচিতদের কাছ থেকে 'মৃত্যুর' হুমকিও পেতেন। এ প্রসঙ্গ থাক। আমাদের প্রশ্ন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [১৮৩৮-১৮৯৪] সাম্যবাদ প্রভাবিত ছিলেন কী? তিনি 'সাম্য' নামে প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। কিন্তু তা যতটা উপযোগবাদ প্রভাবিত, ততটা সাম্যবাদ প্রভাবিত নয়। তবে ঠিক জায়গায় তাঁর চোখ পড়েছিল। তিনি প্রশ্ন করেছেন, বাঙালীর ইতিহাস কোথায়! মনে হয় না, এ প্রশ্নের উত্তর তিনি পেয়েছেন। অষ্টাদশ তুর্কী সেনার বঙ্গবিজয় নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু উত্তর কিছু দেন নি। দিতে গেলে, সম্ভবতঃ তাঁকে কিছু অপ্রিয় সত্য কথা বলতে হতো। তাঁর বোধশক্তি হাহাকার করেছে। যদিও হৃদয় শান্তি পেয়েছে কল্পিত সুন্দর কৃষ্ণ চরিত্রের মাধ্যমে।

বঙ্কিম সাহিত্যে সাহিত্য গুণ অবশ্যই আছে। যদিও এই সাহিত্য গুণ কল্পিত ইতিহাসের আশ্রয় পেয়ে মনোরম হয়েছে। বাস্তবে চোখ ফেরালেই আর সর্বজনগ্রাহ্য থাকেন নি। সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এবং উচ্চবিত্তের কথক বলেই পরিচিতি পেলেন। মানতেই হবে সেকালের প্রেক্ষাপটে বঙ্কিমের মধ্যেই ছিল সমূহ সম্ভাবনা—দর্শন এবং কর্ম সমন্বয়ের। তা হয়নি। এ-কথা বলার অর্থ এই নয় যে, তাঁর সৃষ্টি নস্যাৎ করে দেওয়া হলো। সৃষ্টি তিনি করেছেন এবং তার মূল্যও আছে। কিন্তু আমরা যা চাইছি বস্তুবাদী সাহিত্যের লেখক, তা এখনো পাওয়া গেলনা। এবং এও বলার কথা রামমোহন-বিদ্যাসাগর এবং কিছুটা মধুসূদনও বাস্তবতা এবং বস্তুবাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে ছিলেন। বঙ্কিম সেই খাত পরিবর্তন করে মোটামুটি সামন্তপ্রধান রোমান্টিক জগতে আমাদের নিয়ে গেলেন। জাতীয়তাবোধের মাধ্যমে সমাজ চেতনা এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার যে ধারা এলো তার জনক বঙ্কিমচন্দ্র।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ [১৮৪৪-১৯১১] কিংবা নবীনচন্দ্র সেন [১৮৪৭-১৯০৯] বলার কথা, সমাজের কথা এঁরাও বলেছেন। লিখেওছেন অনেক। কিন্তু প্রথমজন সুখে-দুঃখে উদাসীন কিছু স্টোয়িক চরিত্র

এবং দ্বিতীয়জন একটি ইউটোপিও আদর্শ ছাড়া আর কি দিলেন। এই মন্তব্য নবীনচন্দ্রের আত্মজীবনী প্রসঙ্গে নয়। তিনি কাব্য চর্চা না করে, কথা সাহিত্য সৃষ্টি করলে, মনে হয়, বস্তুবাদী সাহিত্যের একটা প্রেক্ষাপট তৈরী হতে পারত।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৩৮-১৯০৩] কিংবা দ্বিজেনন্দ্রলাল রায় [১৮৬৩-১৯১৩] উনিশ শতকের শেষদিককার স্রষ্টা। এই সময় আমরা জনগণনা থেকে জানতে পারব যে, বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হলো মুসলমানগণ। হিন্দু-মুসলমানে প্রায় সমবিভক্ত এই সমাজের আসল পরিচয় এঁরা দেখালেন কোথায় ?

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রহসন, পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছেন। তিনি হাসির গানের লেখকরূপেও সুখ্যাত। কিন্তু কোথায় সাধারণ মানুষ ? প্রায় নেই। তিনি জাতীয়তাবাদী উদ্দীপনা জাগিয়েছেন সাধারণের মধ্যে। ঐটুকুই তাঁর সাধারণের সঙ্গে যোগ। হেমচন্দ্রের মধ্যেও ঐ 'জাতীয়তা বোধ' ছাড়া আর কী পেতে পারি।

এঁরা সকলেই কিছু পেতে চাইছিলেন। বারে বারে কিছু দেখা কিংবা ইতিহাস খোঁজা কখনোই সার্থক হলো না। অতীত নয় বাঙালীর আছে বর্তমান। তাকাতে হবে ভবিষ্যতের দিকে। যা পারে ওড়িষ্যা বিহার কিংবা আসাম, আমরা তা পারিনা, বাঙালীর ভাবনা, এমনকি স্মৃতিও হতে হবে 'ভবিষ্যতের'। এবার সে কথা।

বিবেকানন্দ

নরেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামী বিবেকানন্দের [১৮৬৩-১৯০২] পিতৃদত্ত নাম। বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী এই মহাপুরুষ। মোটামুটি চল্লিশ বেঁচে ছিলেন এই বিপ্লবী। যে-সকল মহাপুরুষের অকাল-বিয়োগে বাঙালী চিরকাল স্বজন বিয়োগের মর্মান্তিক জ্বালায় হাহাকার করবে বিবেকানন্দ তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান-পুরুষ। প্রস্তুতির জন্য কুড়ি বছর বাদ দিলে, সৃষ্টির জন্য তিনি পেয়েছিলেন মাত্র কুড়িটি বছর। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই সময়কাল ছিল একষট্টি বছর। কবি মধুসূদন সৃষ্টির জন্য পেয়েছিলেন ত্রিশ এবং বঙ্কিম ও কেশবচন্দ্রের ক্ষেত্রে এটা যথাক্রমে ছেচল্লিশ ও ছত্রিশ বছর। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এঁরা সকলেই ছিলেন স্বল্পায়ু। বিবেকানন্দ তো প্রায় যৌবনেই মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

যুবজনের প্রতি বিবেকানন্দের অবিরাম আহ্বান ও আকর্ষণের এটাও একটা কারণ! তিনি দীর্ঘজীবী হলে তার কী প্রতিক্রিয়া হতো তা আমরা কল্পনা করতে পারি কিন্তু জানা হবে না কোনদিনই। পেয়েছি যা, তারই পরিমান এত বিপুল যে, বিবেকানন্দের কাছ থেকে আরো না-পাওয়ার বেদনা আমাদের কিছুমাত্র বিচলিত করেনা। তাঁর কর্মপ্রাচুর্যে বিমূঢ় আমরা ধনীর দুলালের মত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের হিসাবই করলাম না!

ধর্মীয় নেতা রূপেই স্বামী বিবেকানন্দের ভাবমূর্তি আঁকা হয়ে গেছে আমাদের হৃদয়ে। আজও তাঁর জীবন-প্রদর্শনীতে তাঁরই ব্যবহৃত কমণ্ডলুটি রাখি পরম শ্রদ্ধায়। রাখি সযতনে তার গৈরিক বসন। মঠ-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা রূপেই তার দেব ভাব-স্তুতি-সুবলিত মুখচ্ছবি প্রকটিত হয় দর্শকের চিত্তে। যদিও এটা জানাই আছে, তিনি তাঁর আলমোড়ার সাধন কেন্দ্রে কোন মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেননি। বার বার উচ্চারণ করেছেন, 'খালি পেটে ধর্ম হয় না।' আমেরিকা থেকে ভারতে ফিরে এসে তিনি এই জড়সমাজের বুকে 'বোমার মত ফেটে

পড়তে' চেয়েছিলেন। যদিও তাঁর ধর্ম-সভায় যোগদানই বড় করে দেখান হয়।

To my brave boys বলে দেশের যুবশক্তিকে আহ্বান করে বলেছেন, তাদের কাজ করতে হবে. More bread, more oppertunity for every body. এই 'every body' শব্দটা আমাদের ভাবায়। কেননা, এই every body'র মধ্যে দেশের কুকুরটাকেও তিনি মনে রেখেছেন। যদিও উপযোগবাদীরা তখনও সর্বাধিক সংখ্যকের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থার কথাই বলছেন। এই 'প্রত্যেকের জন্য আরো খাদ্য' কথাটি সাম্যবাদের সমার্থক এ-কথা আমি বলবো না! যদিও সাম্যবাদ যা বস্তুবাদীর আদর্শ, তার সঙ্গে বিবেকানন্দের লক্ষ্য অভিন্ন। অর্থনৈতিক সাম্যই বিবেকানন্দের কাম্য সমাজ ব্যবস্থা রূপ-রেখা।

শ্রেণী বিভক্ত সমাজে সাম্য আনতে হলে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন অপরিহার্য। বিবেকানন্দ কি তবে সমাজ সংস্কার করতে চেয়েছিলেন? বিচারপতি স্যার সুব্রামানিয়া কে লেখা একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন —"I fully agree with the educated class in India that a thorough overhauling of society is neccessary." এরপর তাঁকে আর কেবলমাত্র সংস্কারক বলা ঠিক হবেনা। সমাজ সংস্কারকদের চেষ্টা থাকে সমাজ দেহকে রক্ষা করে কোন কোন আধুনিক রীতিনীতির প্রচলন। সেটা সম্ভব করতে চায় গণ-আন্দোলন এবং আইন রচনা করে। ফলে সমাজ কাঠামোটা থাকে অপরিবর্তিত। শোষক আপন প্রয়োজনেই কিছু কিছু সংস্কার মেনে নেয়। যদিও প্রচার করে, এটা দেশের স্বার্থই করা হলো বলে। ১৮৮২'র ইলবার্ট বিল এই রকমই একটি প্রচেষ্টা। কার্লমার্কসের মৃত্যু হয় ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে। তাঁর যুগান্তকারী পুস্তকসমূহ এর আগেই প্রকাশিত হয়ে গেছে।

১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে উচ্চ-শ্রেণীর জন্য সুবিধা আদায় করাই ছিল

সেকালে কংগ্রেসের লক্ষ্য। বিবেকানন্দ প্রতিবাদী ভাষায় বলেছিলেন,—'কতগুলো হাউড়োলোক এক জায়গায় জুটে কেবল গলাবাজি করলেই কি কাজ হয়? চেপে বসুক, নিজেদের ইণ্ডিপেন্ডেন্ট বলে ডিক্লেয়ার করুক?'……স্বামীজী এও বলেছিলেন, "What India needs to day is Bomb." গভর্নর জেনারেল ল্যান্সডাউন এই সময় সরকারী নীতিরূপে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ঘোষনা করেন। প্রকাশ্যে এ-কথা বলে ইংরেজ মুসলমানদের মন্ত্রণা দিত গোহত্যা করতে আর হিন্দুদের উৎসাহ দিত গো-হত্যা বিরোধী বিক্ষোভে। সরকার আশা করতো এর ফলে তীব্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দেখা দেবে। ধর্মনিরপেক্ষতার আসল নাম ছিল বিভেদনীতির প্রয়োগের মাধ্যমে শাসন।

বিবেকানন্দ ধর্মের নামে, বর্ণের নামে সমাজ বিন্যাসের পদ্ধতি অগ্রাহ্য করে নতুনভাবে সমাজ বিশ্লেষণ করেছেন। এবং তার পরিণতি নির্দেশ করেছেন। বিবেকানন্দের এই সমাজ ও সভ্যতার বিশ্লেষণের সঙ্গে বস্তুবাদী-সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা বিবর্তনের ব্যাখ্যার আশ্চর্য মিল দেখা যায়। বিবেকানন্দ লিখেছেন—

"পূর্বে বলিয়াছি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—চারিবর্ণ পর্যায়ক্রমে পৃথিবী ভোগ করে।……আর যাহাদের শারীরিক পরিশ্রমে ব্রাহ্মণের আধিপত্য, ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য ও বৈশ্যের ধনধান্য তাহারা কোথায়?……তথাপি এমন সময় আসিবে, শূদ্রত্ব সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বল বীর্য বিকাশ করিতেছে তাহা নহে, শূদ্র ধর্ম কর্ম সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল। [তুলনীয়—কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোর সেই অননুকরনীয় শুরু—'A spectre is haunting Europe—The spectre of communism.' অনুবাদ—এক অশরীরী মূর্তি ইউরোপ তোলপাড় করছে—সাম্যবাদের অশরীরী মূর্তি।'] সোস্যা-

লিজম, এনার্কিজম, নাইহিলিজম প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা”……।

“শূদ্র-জাতির একে বিদ্যার্জনের বা ধনসংগ্রহের সুবিধা বড়ই অল্প, তাহার উপর যদি কালে দুই একটি অসাধারণ পুরুষ শূদ্রকুলে উৎপন্ন হয়, অভিজাত সমাজ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উপাধি মণ্ডিত করিয়া আপনাদের মণ্ডলীতে তুলিয়া লন।

……বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ ও নারদ, দাসীপুত্র সত্যকাম জাবাল, ধীবর ব্যাস, অজ্ঞাত পিতা কৃপ-দ্রোণ-কর্ণাদি সকলেই বিদ্যা ও বীরত্বের আধার বলিয়া ব্রাহ্মণত্বে বা ক্ষত্রিয়ত্বে উত্তোলিত হইল, তাহাতে বারাঙ্গনা, দাসী, ধীবর বা সারথি কুলের কি লাভ হইল বিবেচ্য।

আধুনিক ভারতে শূদ্রকুলোৎপন্ন মহাপণ্ডিতের বা কোটীশ্বরের স্ব-সমাজ ত্যাগের অধিকার নাই। কাজেই তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও ধনের প্রভাব স্বজাতিগত হইয়া স্বীয় মণ্ডলীর উন্নতিকল্পে প্রযুক্ত হইতেছে। – ‘বর্তমান ভারত’।”

এই বিশ্লেষণে প্রতিফলিত হয়েছে ঐতিহাসিক বিবর্তন চিত্র। ব্যবহৃত হয়েছে দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি এবং ফুটে উঠেছে বস্তুসত্যের প্রাধান্য। বিবেকানন্দ সমাজ সংস্কারক মাত্র ছিলেন না। তিনি নতুন সমাজ গঠন করতে চেয়েছিলেন। যার চালিকা শক্তিরূপে তিনি বসাতে চেয়েছিলেন শূদ্র শক্তিকে। সাহিত্যের ইকিহাসে বিবেকানন্দের ভূমিকা এবং অবদান কতটা? ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে শোষিত শ্রেণীর পক্ষে যারাই কলম ধরেছেন, তারাই কথ্য ভাষাকে তাদের লেখার মাধ্যমরূপে বেছে নিয়েছেন। ধর্ম, দর্শন কিংবা সাহিত্য যা কিছুই জনতার কাছে নিয়ে যেতে হবে তা জনতার বোধগম্য ভাষায়, শব্দে বলতে হবে, লিখতে হবে। এই বিষয়টা বিবেকানন্দ এইভাবে বলেছেন—

“বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত—যারা লোকহিতায় এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন।” ভাষা বিবর্তিত হয়। শব্দের অর্থ সঙ্কোচন বা অর্থ প্রসারণের ফলে এটা

হয়। প্রাচীন শব্দের ব্যবহারে, কখনও কখনও ভাষার গঠন তাই অর্থবহ হয়ে উঠে না। বিবেকানন্দ সেটা লক্ষ্য করে বলেছেন—"তখুনি বুঝতে পারবে যে, যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জেন্ত কথা কয়, মরে গেলে মরা ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নতুন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দুএকটা পচা ভাব রাশীকৃত ফুল চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়। বাপরে সে কি ধুম—দশ পাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম করে, 'রাজা আসীৎ' !!! আহাহা! কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ !! ওসব মড়ার লক্ষণ। যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হ'ল, তখন এইসব চিন্তা উদয় হ'ল। ওটি শুধু ভাষায় নয়, সকল শিল্পতেই হল।" —'বাঙ্গলা ভাষা'

স্বামীজীর ভাষা বাহুল্য বর্জিত, তেজোদৃপ্ত কিন্তু সাধারণের ভাষা। শূদ্রের ভাষা। সেকালে শূদ্র জাগরণের প্রধান বাধা যে ইংরেজ শাসক, তা'ও তিনি বলেছিলেন। ..."ব্রিটিশ সৈন্য ভারতের পুরুষদের খুন করছে, মেয়েদের মর্যাদা নষ্ট করছে। বিনিময়ে ভারতেরই পয়সায় জাহাজে চড়ে দেশে ফিরছে পেনসন ভোগ করতে।" দেশ প্রেম আর স্বাধীনতা কামনাও তাঁর মধ্যে ছিল প্রবল। সেই প্রাধান্য প্রবাহিত হয়েছিল তাঁর মানস কন্যা নিবেদিতার মধ্যে। মুক্তি সংগ্রাম অপরিহার্য জেনেই যুবশক্তিকে ডাক ছিয়েছিলেন, "বঙ্গদেশের হে তরুণদল" বলে।

বিবেকানন্দের কালে তিনিই ছিলেন বস্তুবাদীদের মধ্যমণি। কাজে ও কথায় অভিন্ন। দেশপ্রেমে দ্বিতীয় রহিত। চলিত ভাষায় সার্থক সাহিত্য রচনার প্রথম পুরোহিত। বিবেকানন্দ যুবক। যুবকেরা স্বপ্ন দেখে। তিনিও তা দেখতেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল সর্বমানবের বিকাশে সহায়ক ভারত গড়ার। শূদ্রের জাগরণ তিনি চেয়েছিলেন, তার জন্য তাঁর প্রচেষ্টার বিরাম ছিল না। তাই, বাংলা সাহিত্যে বস্তুবাদী সাহিত্য বিকাশে বিবেকানন্দের দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়! তাঁর অকাল প্রয়াণ ক্ষোভের। বেদনার। দেখা যাবে যাঁরাই সার্থক বস্তুবাদী সাহিত্য সৃষ্টির কাজে নেমেছিলেন তাঁরা কেউই

দীর্ঘজীবী হন নি। বাংলা সাহিত্যে বস্তুবাদী ধারাটি তাই কখনোই নিরবচ্ছিন গতিসমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারেনি। ফুঁসে উঠেই তা যেন হারিয়ে যায় গ্রীষ্মের দামোদরের মত। বর্ষাপ্লাবিত জনপদ-বৃদ্ধেরাই জানেন কী দাপান দাপিয়েছিল এ নদ'ই গত বর্ষায়।

স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি কর্মের প্রেরণা এবং চিন্তাও। তিনিই তাঁর কালের অগ্রজ দেশপ্রেমিক। দেশ-প্রেমের জন্য শুধু কথাই নয় কাজের খসড়াও তিনি দিয়েছিলেন, এ-জন্য তারুণ্যের প্রতি আস্থা রাখার চিন্তাও তিনি করেছেন। শোষক ইংরেজ-শক্তির স্বরূপ তিনিই উদ্‌ঘাটিত করেছেন। তাঁর কাছেই পেয়েছি স্বাধীনতার তীব্র কামনা। এ-জন্য শূদ্র তথা শোষিতের ভাষাকে তিনিই সার্থকভাবে লেখায় ব্যবহার করেছেন। এই শেষের কাজটির মূল্য কোন ধনেই মাপা অসম্ভব। সকলের জন্য ভাতের তথা সাম্য চিন্তাও তাঁর কাছে আমরা পেয়েছি, যখন অন্য সকলের মনে বেশী লোকের জন্য ভালো ব্যবস্থার চিন্তাটাই ছিল প্রবল।

রবীন্দ্রনাথ

১৯০২-এ বিবেকানন্দের তিরোধান। ১৯০৩-এ প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস 'চোখের বালি'। যে-উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে প্রথম এনেছিল 'আঁতের কথা।' সমাজের দ্বান্দ্বিক রূপ এবং পরিণতি সম্বন্ধে বিবেকানন্দের প্রবন্ধরাজি, রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের বস্তুবাদী ধারার ভূমিকা স্বরূপ। বিবেকানন্দ তাই রবীন্দ্রনাথের পূর্বে উল্লিখিত হলেন। যদিও রবীন্দ্রনাথের জন্ম স্বামীজীর জন্মের একবছর আগে।

সিংহ-হৃদয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন না, মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ মন্ত্রের ঋষি রবীন্দ্রনাথ। ১৮৮৬'র মে-দিবসের ঘটনা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল বলে, মনে হয় না। শরৎচন্দ্রের অনুরোধে 'পথের দাবী'র সমর্থনে কিছু বলতে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। সিদ্ধরস ভঙ্গের জন্য বহু ভাষাবিদ কবি মধুসূদনকে তিনি সমালোচনা করেছেন। তবুও, উনবিংশ শতাব্দীর আশির দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ কালসীমা রবীন্দ্রশতাব্দী বলে উল্লিখিত হবে এবং হতে থাকবে। কেন?

সব কিছুতেই তিনি নেই। কেননা, তিনি তো দেবতা ছিলেন না। দেবতারাই সর্বত্র বিরাজমান। তিনি স্পর্শ করেননি অনেককিছু। তবুও তাঁর দ্বারা এই সময়কালের সব ঘটনা প্রভাবিত। তিনি যাতে ছিলেন না—কেন ছিলেন না, সে প্রশ্ন উচ্চারিত হবে। তিনি যাতে ছিলেন—কী করেছেন তা খুঁজে দেখা হবেই। বাদ-প্রতিবাদ-পরিণাম রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সমন্বিত হয়েছিল। কোন না কোন পক্ষাবলম্বন করে এই ভূমিকা এক সময় পালন করেছেন, রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং রাজা রাধাকান্ত দেব। তিনি হয়ে উঠলেন বাঙালীর ইতিহাস। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। ঐ বছরেই সৈয়দ আমীর আলী প্রতিষ্ঠা করেন ন্যাশনাল মহামেডান এ্যাসোসিয়েশন। আলীগড়ে

এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল স্কুল কলেজ হলো। ঐ বছরেই বিধিবদ্ধ হলো,—[ক] ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট ও [খ] লাইসেন্স অ্যাক্ট। সাহিত্য জগতে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ১৮৮১তে। ঐ বছর প্রকাশিত হয় [১] নাটক, রুদ্রচণ্ড [২] বাল্মীকি প্রতিভা [নাটক] ও (৩) ভ্রমণ বিবরন—যুরোপ প্রবাসীর পত্র।

মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত [১৯৪১] তিনি লিখেছেন, কবিতা, গান, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস এবং নাটক। মাঝে মধ্যেই যোগ দিয়েছেম বিভিন্ন আন্দোলনে। ব্যাপৃত থেকেছেন শিক্ষা বিস্তার ও গঠন মূলক কাজে [শান্তিনিকেতন—শ্রীনিকেতন], সঙ্গে ছিল দেশ ভ্রমণ। বহু দেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন। রবীন্দ্র প্রতিভা প্রসঙ্গে বিকাশ কিংবা অভিব্যক্তি কোন শব্দটি ব্যবহৃত হবে? বিতর্ক থাকবেই। তবুও চোখের বালি পূর্বঅধ্যায়কে প্রতিভার বিকাশ এবং উত্তর পর্বকে অভিব্যক্তি বলে ব্যাখ্যা করা যায়। কেননা, বিকাশে দলের উন্মোচনকিন্তু অভিব্যক্তিতে জিনের পরিবর্তন ঘটে। প্রথমটা নির্দিষ্ট কিছু পূর্ণতা পায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নতুন ধারা আসে। পরিবর্তনটা গুণগত।

তিনি শুরু করেছিলেন প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য নিয়ে। কিছুটা বা ধর্মীয় প্রভাব যুক্ত হয়ে। একসময় বাংলার 'মাটি জল' তাঁকে টেনেছে। আবার ফিরলেন সেই মহাভারতে 'আনত শিরে'। সভ্যতার সঙ্কটে বিচলিত কবি। এবার তিনি বিজ্ঞানী। তিনি বিশ্বকে দেখলেন নতুন বোধে। বললেন,—"উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে।"

এই পর্যায়ে কবির মধ্যে অভিব্যক্তির প্রকাশ। ধীর কিন্তু স্থির পদক্ষেপে হয়েছিল তাঁর এই ক্রমবিবর্তন। তাই তাঁর কবিতায় দেখা যায় ভাস্কর্যের সচ্ছন্দ প্রকাশ আবার উপন্যাসে গথিক স্থাপত্যের লক্ষণ। স্মরণীয় —ইট-কাঠ ধাতু দিয়ে বাঙালী তেমন কোন ভাস্কর্য বা স্থাপত্য রচনা করতে পারেনি।

বিশ্ব থেকে ভারত আর ভারত থেকে বিশ্ব দেখার ফলে যে প্রজ্ঞার তিনি অধিকারী, তাই তাঁকে দিয়েছিল এই কঠিন পেলবতা। সঠিক

বিশ্ববোধের আর এক নাম বস্তুবাদী প্রজ্ঞা। যদিও রাজনৈতিক বাতাবরণ যুক্ত যে বস্তুবাদী দর্শন, তাঁর কাছে তা আমরা পাইনি। বস্তুর প্রবহমানতায় তিনি ছিলেন আস্থাবান। তবুও, আমাদের আশ্চর্য করে, তিনি ভাববাদী এবং সুফী সাধক হয়েই থাকা যেন পছন্দ কছতেন। তাঁর কাব্যে, তাঁর কর্মে বস্তুবাদের বিকাশ ঘটেছে। তবুও, তিনি নিজে বস্তুবাদী নন। তাঁর সাহিত্য বহুক্ষেত্রে বস্তুবাদের—প্রগতির তুরন্ত হাতিয়ার।

সমাজ বিবর্তিত হয়। আদি সাম্যবাদ হারিয়ে যায়। দেখা দেয় প্রভু-দাস আর সামন্তবাদী সমাজ। তাও স্থায়ী হয় না। বুর্জোয়া-পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী-সমাজ আসে। পরাধীন দেশে জাতীয় চেতনার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। আসে বিশ্বচেতনা। পরিণামে সৃষ্টি হয় সমাজতান্ত্রিক এবং সাম্যবাদী সমাজ। লেখক যখন সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিশ্বাস রেখে সচেতনভাবে তাঁর কলম চালনা করেন, তখন তিনি বস্তবাদী সাহিত্যিক। তাঁকে সংগ্রামরত হতে হবে সমাজ বিবর্তমের কাজে এবং পরের ধাপে পৌঁছনর জন্য। এই প্রচেষ্টা হবে অবিরাম।

বিস্ময়কর ঘটনা এইটাই রবীন্দ্রনাথ বস্তুবাদী না হয়েও এই কাজটাই করেছেন। অনেকেই বুর্জোয়া শব্দ নিয়ে বিভ্রমে পড়েন। পরাধীন ভারতের সামন্তবাদী সমাজে বুর্জোয়া চরিত্রও প্রগতিসূচক। রবীন্দ্রনাথের আগে সাহিত্য ছিল মূলত সামন্তবাদ প্রভাবিত। তারপরেও এর প্রভাব ছিল তীব্র। রবীন্দ্রনাথ মধ্যশ্রেণী, শহুরে এবং বুর্জোয়া মূল্যবোধ এনেছিলেন সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথ এইখানে থামলে হতেন মহৎ। কিন্তু তা তিনি করেননি। তিনি পৌঁছে গেছিলেন আন্তর্জাতিকতার যজ্ঞশালায়। তাইতিনি মহান। সাহিত্যে তিনি 'তুলনাহীন'। তাঁর জীবনবোধ অতলস্পর্শী, অবশ্য মনুষ্যত্বে সর্বজ্ঞ। সৌন্দর্য চেতনা বিস্ময়কর।

তিনি একলা চলার জন্য সঙ্গীত রচনা করেছেন। এতো বস্তুবাদীর পথ নয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু [১৮৮৯—১৯৪৪] নিজেকে

নিরপেক্ষ বলায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু [১৮৯৭-১৯৪৫ (?)] এক চিঠিতে অভিযোগ করেছিলেন। নেতাজীর যুক্তি ছিল, নেহরু নিজেকেনিরপেক্ষ এবং সমাজতন্ত্রী বলেন। এ'দুটো কোন লোক সম্বন্ধে একই সঙ্গে ব্যবহার করা যায় না। বস্তুবাদী সর্ব অবস্থায় চায় সমবেত চলা। মনস্ক পাঠক মাত্রেই জানেন, রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,—"আমি দেশ প্রেমিক নহি।" অবশ্য তার প্রসঙ্গ ছিল ভিন্ন। সেটা বিবেচনা না করেই, এজন্য রবীন্দ্রনাথকে, মণীষী বিপিন চন্দ্র পাল [১৮৫৮—১৯৩২] এবং শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় [১৮৬১—১৯৪৪] এ জন্য রূঢ় সমালোচনা করেছিলেন। আসলে পরাধীন বুর্জোয়া সমাজ জাতীয়তাবাদের বাইরে কিছু দেখতে পায় না। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 'বিশ্বপথিক', [তুঃ সব ঠাঁই মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর লব খুঁজিয়া—] আন্তর্জাতিকতাবাদী। ভারতবাসীর এটা সঠিক বুঝতে সময় লেগেছিল। সচেতন রাজনৈতিক কর্মী শরৎচন্দ্রেরও কী তা লাগেনি? পথের দাবী প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিঠি এবং শরৎচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া স্মরণীয়। আর তাই অবুঝদের কাছে তীব্র বিদ্রূপে ক্ষত-বিক্ষত হতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে।

এবার আলোচ্য রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া। বঙ্গভঙ্গ বিরোধীতায় তিনি শুধু সঙ্গীত রচনা করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি সক্রিয়ভাবে রাখি-বন্ধন অনুষ্ঠানেও যোগ দিয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ [১৯১৪-১৯১৮] শেষ। যুদ্ধ-সহায়তার প্রতিদানে গান্ধীজী [১৮৬৯-১৯৪৮] আশা করেছিলেন স্ব-শাসন। ইংরেজ দিল ভারত শাসন আইন আর রাউলাট বিল। প্রতিবাদে গান্ধীজী করলেন আইন অমান্য। ইংরেজ তারও উত্তর দিয়েছিল। পঞ্জাবের জালিয়ালওয়ালা বাগ হত্যা কাণ্ডের মাধ্যমে। ইংরেজের নির্মমতায় গান্ধীজী বিচলিত হলেন কিন্তু উত্তর দিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁর নাইট উপাধি বর্জন করে। এর আগে ইংরেজ জাতির এই সর্বোচ্চ সম্মান কেউ বর্জন করার সাহস দেখায় নি। এ-হলো নিশ্চলের চলা'। দেখা যায় না, কিন্তু উপলব্ধি করা যায়।'

যদিও বুর্জোয়া জীবনের যা কিছু ভালো তা তিনি দেখেছেন বড় ইংরেজের মধ্যেই। রবীন্দ্র-সাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটেছে। তফাৎ এইটুকুই ভারতবাসীর সঙ্গে—ইংরেজ ছিল স্বাধীন এবং সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। ভারতবাসী পরাধীন এবং শোষিত। ভারতবাসীর জাতীয়তা বোধ এসেছে তার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা থেকে এই আকাঙ্ক্ষা ছুটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। একটি অহিংসা নীতি প্রভাবিত অপরটি সহিংস কর্মে বিশ্বাসী। রবীন্দ্রনাথ তার আন্তর্জাতিক চেতনার দ্বারা নিশ্চয় করে বুঝে ছিলেন এই দ্বিতীয় পথটি কাম্য নয়। কেননা, এই ধরণের আন্দোলন ব্যক্তি-নির্ভর হয়ে উঠে। এ-কারণেই তিনি অস্বীকার করেছিলেন, পথের দাবীর জন্য সরকারের কাছে আবেদন করতে। প্রতিবাদের এটা হলো নেতিবাচক মনোভাব। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এটা বেমানান। তাই তিনি লিখেছিলেন, ঘরে বাইরে [১৯১৬] ১৯২৬-এ প্রকাশিত হয় পথের দাবী। সুকান্তর জন্ম ঐ বছরেই। ১৯১৭ এ ভারতের রাজনৈতিক ডামাডোল চরম পর্যায়ে। সাইমন কমিশন, গোল-টেবিল বৈঠক, হিন্দু-মুসলিম এবং বর্ণহিন্দু-অনুন্নত সম্প্রদায়ের বিরোধের সময়কাল এটা। ১৯৩৫-এ ইংরেজ ভারতের জন্য চালু করে যুক্তরাষ্টীয় বিধান। রবীন্দ্রনাথের লেখা সবকটি উপন্যাসের প্রয়োজন নেই আমাদের আলোচনায়। "ঘাতকতা" এবং ব্যক্তি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে চার অধ্যায় লিখে রবীন্দ্রনাথকে সহ্য করতে হয়েছিল প্রবল সামাজিক প্রতিকূলতা। এই সাবধান বাণী আজও প্রয়োজন।

১৯১৭-এ ভারতে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের শুরু। আর রুশদেশে প্রতিষ্ঠিত হলো সর্বহারার সরকার। এর ঠিক একবছর আগে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করলেন ঘরে বাইরে এবং 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস ছুটি। নিখিলেশ সন্দীপ চরিত্র ছুটি গ্রাম্য সামন্ত শ্রেণীরই প্রতিনিধি। নিখিলেশ চাকুরী করেনা। জমি নির্ভর। কিন্তু অসাম্প্রদায়িক। রাজনীতি করেও সে-উদারতা নেই সন্দীপের। অথবা সততা কিংবা সাহস। চতুরঙ্গে আছে জিজ্ঞাসা তথা মুক্ত মনের কথা। যুক্তিবাদী

মানুষের চিত্র, মনের কথা প্রসঙ্গে চোখের বালির উল্লেখ অপরিহার্য। সামন্ত কাহিনী নয়, বুর্জোয়া আত্মকেন্দ্রিকতাও নয়। জটিল মনের আঁতের কথা বাংলা সাহিত্যে এলো রবীন্দ্রনাথেরই হাত ধরে। এই ১৯০৩ এ যতীন মুখোপাধ্যায় দার্জিলিঙে অনুশীল সমিতির শাখা বান্ধব সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০১ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম। তার মাত্র দুবছর আগে জন্ম হয়েছে, কাজী নজরুল ইসলাম এবং জীবনানন্দ দাসের [১৮৯৯]।

১৯০৯-এ হলো মর্লি-মিন্টো সংস্কার। বেশ কয়েকটি ডাকাতি হলো সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা। এলো ১৯১০। কলকাতার শিখ ট্যাক্সি ড্রাইভারদের সহযোগিতায় শুরু হলো ট্যাক্সি ডাকাতি। বীরেন্দ্র দত্ত গুপ্তের গুলিতে আলিপুর কোর্টে নিহত হলেন দারোগা সামসুল। ইনি ললিত চক্রবর্তীর কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করে ৫৫ জন বিপ্লবীর বিরুদ্ধে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করেন। এই বছরেই প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদী উপন্যাস গোরা। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস কোনটি, তা নিয়ে দ্বিমত হতেই পারে। কিন্তু বিচারে বসলে গোরাকে মাথায় রেখেই আলোচনা শুরু করতে হবে।

গোরা কে? রবীন্দ্র চিন্তায় যে আদর্শ মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় তারই সাহিত্যরূপ গোরা। রবীন্দ্র জীবনের ছায়া আছে গোরার মধ্যে। অভিব্যক্তির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের মহিমময় বিকাশ। গোরার পূর্ণতা এসেছে গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ একসময় চিন্তা-ভাবনায় ছিলেন সনাতন পন্থী। তার কিছু পরিচয় পাওয়া যেতে পারে ব্রাহ্মণ নামক প্রবন্ধে। সেখানে তিনি থামেন নি! 'বিপুলা এ পৃথিবীর' কথা তিনি যতই জেনেছেন ততই পবিবর্তিত হয়েছে তাঁর চেতনা বোধ। একসময়ের জাতীয়তাবাদী বিবর্তিত হয়ে হলেন আন্তর্জাতিকতাবাদী। পেলাম আমরা আর এক রবীন্দ্রনাথকে। রবিবাবু হলেন রবীন্দ্রনাথ, যিনি মানবধর্মে আস্থাশীল এবং স্থিতধী। বিশ্বপথিক এবং বিশ্বজনীনও। এই যে সনাতনী চিন্তা থেকে বিশ্বজনীন

মানবতাবোধে আস্থা স্থাপন, এই রবীন্দ্রনাথেরই প্রতিরূপ গোরা। প্রাক্ বস্তুবাদী সমাজের এই প্রবণতাগুলোই বস্তুবাদী সমাজে পৌঁছতে সাহায্য করে। বাংলা সাহিত্যে এই ধারাটা সাহিত্য রসে পরিপূর্ণ করে এর আগে আর কেউ এমন করে প্রকাশ করেন নি।

এটা ভাবার কোন কারণ নেই যে গোরা হলো তত্ত্বকথার উপন্যাস। কেবল তত্ত্ব প্রচারের জন্য একটি চমৎকার প্রবন্ধ লেখা যেত। গোরাকে অনেকে তো প্রেমের উপন্যাসই বলেন। এতে আছে, লাবণ্য-সুধীর, [লাবণ্যকে আবার আমরা পাব শেষের কবিতা উপন্যাসে] সুচরিতা গোরা আর ললিতা-বিনয়ের প্রেম-কাহিনী। গোরার স্বদেশ প্রেম, প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যে বিশ্বাস, পরিশেষে সংস্কার মুক্ত ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বজনীনতায় উত্তরন—বস্তুবাদীর কাছে পরম কাম্য বিবর্তন। ধর্ম যে সংস্কার মাত্র, গোরার বিবর্তন তার প্রমাণ।

'সোনার তরী' কবিতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সমাজ ব্যক্তিকে নয় তার কর্মকেই চায়। এই যে বোধ, 'ব্যক্তি' নয় কর্মই বড়, এইটি বস্তুবাদীর প্রাণের কথা। এবং শেষ কথাও। সোনার তরী কাব্য গ্রন্থের প্রকাশ কাল ১৮৯৪। কাব্যে কবি খুঁজেছেন, ধরতে চেয়েছেন সুন্দরকে। তাঁর কবিতায় অধিকার রক্ষা এবং সংগ্রামের কথা সাধারণ ভাবে এর পরে এসেছে। কিন্তু ঠিক সময়ে ঠিক কথাটি বলতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির স্বপক্ষে এবং ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠ অমোঘ বাণী শুনিয়েছে। তিনি শুনতে পেয়েছেন, 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস।' এবং এদের বিরুদ্ধে সাধারণের পক্ষে সংগ্রামের অংশীদার হতে চেয়েছেন। সেঁজুতি কাব্যে তো বলেই দিলেন,

'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক
আমি তোমাদেরই লোক,
আর কিছু নয়
এই মোর শেষ পরিচয়।'

যেটা অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তা, হলো এবার

এসেছে বস্তুর প্রতিফলন। মনের রঙে বস্তু রঞ্জিত হয়ে উঠছে না। বস্তুর স্বরূপ মনে প্রতিফলিত হচ্ছে এবং প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। 'নবজাতক', 'পুনশ্চ' অথবা 'পরিশেষ'এ তো এটাই পাই। তাই 'গুবরে পোকা' কিংবা রাস্তার 'ছেলেটা' তথাকথিত 'সুন্দর' না হয়েও উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে।

'বলাকা' কাব্যে যে রবীন্দ্রনাথকে পাই, তিনি তাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ। পৃথিবী বিবর্তিত হচ্ছে। গতি শুধু গতি। থামা চলবে না। থামা যায় না। তাই তো উত্তর মেলে না।

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তরে নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি।

মেলেনি উত্তর। কি উত্তর দেবে? প্রশ্ন করার সময় যে বিশ্ব ছিল উত্তর দেবার মুহূর্তে তা যে পাল্টে গেছে। আবার উত্তরটি শ্রোতা যখন শুনবে তখনো তো নতুন কিছু ঘটবে। সেকারণেই

দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগরতীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি।
পেল না উত্তর।

লক্ষ্য করার মত বটে 'কে তুমি' লাইন দুটিতে একবারও প্রশ্নবোধক চিহ্ন নেই! কবিকে বলে দিতে হচ্ছে এটা প্রশ্ন। বিশ্বের অপার রহস্যের কতটুকু আমরা জেনেছি? কী উত্তর দেওয়া হবে? বিধাতা একদিন এই বিশ্ব সৃষ্টি করলেন। আসলে যে প্রশ্নের কোন উত্তর আমার জানা নেই সে সম্বন্ধে প্রশ্নটা কী হবে? তাই 'সত্তার' পরিচয় সম্বন্ধে প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট ভাষাটাই যে অনায়ত্ত। মানুষের মনে জিজ্ঞাসা আছে। সেইটুকুই বলা।

বস্তুবাদীর কাছে এটা খুব জরুরী প্রশ্ন। কতটা জানা হলো।

বস্তুর স্বরূপ কী? এই প্রশ্নের মূলে গেলে দেখা যাবে, বিশ্ব নানান বস্তুর সমন্বয়। সেটা [পদার্থ] মৌলিক কিংবা যৌগিক যেটাই হোক, তাতে আছে অসংখ্য অণু পরমাণু। আর এদের মধ্যে চলছে নিয়ত পরিবর্তন—সংগ্রাম। জীবনের আর এক নাম তাই সংগ্রাম। 'জীবনের জয়গান' হলো ভালো কাজ। সেই জীবনই আরো ভালো হওয়ার জন্য সদা চঞ্চল। তথাকথিত নৈতিকতার নীতিবোধ দিয়ে কোন কিছুই স্থায়ী ভাবা চলবে না।

বিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ তাই এবার সংগ্রামী রবীন্দ্রনাথ। অবশ্যই তাঁর হাতিয়ার কালি ও কলম। তিনি 'প্রশ্ন' করেন। তিনি আফ্রিকার শোষিত জনগণের কথা ভাবেন। শোষণের জন্য তীব্র ধিক্কার দেন শেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদীকে।

সবচাইতে পূর্ণ মানুষও অপূর্ণ। আত্মসমীক্ষা বস্তুবাদের অপরিহার্য অঙ্গ। কবিকে দেখি জীবন সায়াহ্নে এসে আত্মসমীক্ষায় রত। 'ঐকতানের' পরও তিনি বহু কবিতা রচনা করেছেন। কবির মনে হয়েছে মাটির কথা, মাটির মানুষের কথা বলা হয়নি। রূপ-রস-ছন্দ-গল্প সব আছে, সবই চাই। কিন্তু মাটির কাছাকাছি মানুষের কথা সবার উপরে স্থান পাবে। চিরন্তন। এ-কথাটা তো তেমন করে বলাই হয় নি। এও তিনি জানিয়ে দিচ্ছেন এবং উদার হৃদয়ে দুবাহু বাড়ায়ে যে এ-কথা বলবে তার আগমনের জন্য প্রার্থনা করছেন। এই রবীন্দ্রনাথই বস্তুবাদীর আপনজন।

বস্তুবাদী রবীন্দ্রনাথকে কবিতায় নয়, প্রবন্ধ বা গল্পেও নয়, পাওয়া যাবে নাটকে। তাঁর নাটক, বিশেষ করে 'রক্তকরবী', রথের রশি, এবং 'মুক্তধারা', যে-কোন বস্তুবাদ-বিশ্বাসী নাট্যকারের ঈর্ষার কারণ হতে পারে।

'রক্তকরবী' প্রসঙ্গে কবির লেখা ভূমিকাটি অবশ্য পাঠ্য। এই অবশ্য পাঠ্যের তালিকায় আরো রাখতে হবে কবির কিছু পত্র, প্রবন্ধ এবং বক্তব্য। ভাববাদী সমালোচকগণ বলে থাকেন এটি রূপক নাটক। রোমান্টিক নাটকও বলেন কেউ কেউ! রবীন্দ্রনাথ নিজে

কিন্তু বলেন,—"আমার রক্তকরবী পালাটিও রূপক নাট্য নয়।'...এবং কবির "জ্ঞান বিশ্বাস মতে এটি সম্পূর্ণ সত্য।" এই সত্যটা কী? কবি নিজে বলেন,—"মকররাজের সঙ্গে প্রজাসাধারণের এই বিরোধ... শ্রেণীগত মানুষের"। শোষিত শ্রেণীর শ্রেণীবদ্ধভাবে সংগ্রাম রবীন্দ্রনাথ আর কখনো এত স্পষ্ট করে বলেন নি। ধনতান্ত্রিক বুর্জোয়া সমাজের গঠনও এই নাটকে ঠিক ঠিক দেখান হয়েছে। কবি যাদের 'সর্দার' বলেন, তারা ধনী সম্প্রদায়ের খুব কাছের লোক। এরা সদা সতর্ক। শ্রমিক শোষণে এরা যন্ত্রের মতই নিপুণ, এবং ক্লান্তিহীন। প্রতিহিংসা চরিতার্থতায় এবং শোষণের নূতন নূতন পদ্ধতি আবিষ্কারে এরা যন্ত্রবৎ হৃদয়হীন। সর্দার জানে মার খেয়ে শোষিতরা প্রথম যেখানে পড়ে তারপরও তারা খানিকটা চলতে পারে। এর পরের শ্রেণী মোড়ল। এরাও শ্রমিক। কর্ম-নিপুণতা এবং আনুগত্যের মাধ্যমে একধাপ এগিয়ে গেছে। সাধারণ শ্রমিক শোষণে এরা সর্দার অপেক্ষাও দক্ষ এবং নির্মমও। অপর পক্ষে অজ্ঞাতসারে এরা স্বজাতিদ্রোহী।

ধনতন্ত্রী-পুঁজিবাদী সমাজে পুরোহিত সম্প্রদায় শোষণের অন্যতম অপরিহার্য হাতিয়ার। শোষিত শ্রেণীর মধ্যে প্রতিবাদের সম্ভাবনা দেখলেই এরা মন্ত্রের নামে ঘুমপাড়ানী গানের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। রক্তকরবীতে এরা গোঁসাইজী।

আমরা জানি নাটকটি লেখা হয় ১৯২৩-এ। প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯২৪-এ। পুস্তকাকারে এর প্রকাশ ১৯২৬-এ। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল এটি অভিনয় করার। হয়নি! কেন?

১৯২৩-এ ভারতে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা নীতি কার্যকর হয়। ১৯২৭-এ সাইমন কমিশন ও তিনবার গোলটেবিল বৈঠক হয়। এই সময় সাম্প্রদায়িক বিরোধ ছিল তুঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর তথাকথিত 'জাতীয়তাবিরোধী' মত ও আন্তর্জাতিক চেতনার জন্য তীব্রভাবে সমালোচিত হচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথের ভয় ছিল, এ-নাটকের জন্য তাকে আরো ভুল বোঝা হবে। বিশেষ করে, ভাববাদী বলে তাঁকে যাঁরা জেনে এসেছেন, তাঁরা এই শ্রমিক দরদী রবীন্দ্রনাথকে কিছুতেই গ্রহণ

করবেন না। বলেওছেন তিনি সেকথা। 'এ-পালা সাঙ্গ হলে আমার দিকে কুত্তা লেলিয়ে দেবে"। রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন 'কু'ত্তা শব্দটি। যদিও তিনি জানতেন, এতে ওরা "দন্তস্ফূট করতে পারবে না"। ১৯২৩-এর পর এখন ১৯৪৪। দন্তস্ফুটে অক্ষম ব্যক্তিরা এখনও কুত্তা লেলিয়ে দিতে উৎসাহী। যদি কথা বলা হয় শোষিত শ্রেণীর পক্ষ নিয়ে।

'মুক্তধারা' নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৯২৫-এ। নাটকের কাহিনীটির সার কথা :--যন্ত্ররাজ বিভূতিকে দিয়ে ঝরণার জল বেঁধে শিব তরাইয়ের সঙ্ঘবদ্ধ প্রজাদের শাস্তি দিতে চাইছে উত্তরকূটের শাসক। বিভূতি এমন এক যন্ত্র বানালেন যার সাহায্যে ঝরণার জলের প্রবাহ ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করার চাবি রইল উত্তরকূটের রাজার হাতে। উত্তরকূটের রাজা একটি কুড়িয়ে পাওয়া শিশু লালন পালন করেন। নাম তার অভিজিৎ। তিনি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। অভিজিৎ যন্ত্রের দুর্বলতম স্থানটির কথা জানতেন। আর তারই নেতৃত্বে সেইস্থানে আঘাত করে যন্ত্রটি ধ্বংস করা হলো। নেতা অভিজিত মারা গেলেন এই প্রতিবাদী কর্মযজ্ঞে। অভিজিৎ আত্মদান করে মুক্ত করে দিয়ে গেল তৃষ্ণার জল।

রক্তকরবীতে আমরা বিপ্লবের নেতা রঞ্জনকে পাইনি। মুক্তধারায় নেতাকে সংগ্রামের ময়দানে নিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ। ওই নাটকে সমষ্টি ব্যষ্টির উপর স্থান পেয়েছে। কবি বিপ্লবী তত্ত্ব এবং নেতৃত্বকে সামনে আনলেন। বিপ্লবী দল এলো 'রথের রশিতে'। রথের রশিতে বিবেকানন্দের কথায় শূদ্রত্ব সহিত শূদ্রের জয়। 'মুক্তধারার' অভিজিৎ-এর জন্মকথা অস্পষ্ট। কিন্তু সে পালিত হয়েছে রাজগৃহে।

রাজমন্ত্রী কিংবা ব্যবসায়ী কেউই পারেনা কালের রথকে সচল করতে। জনতার স্পর্শ পেলে কালের গতি বা রথ সচল হয়। এই তিনটি নাটকে বস্তুবাদী তত্ত্ব প্রস্ফুটিত হয়ে শোষিতের বিজয়মাল্যে রূপান্তরিত হয়েছে। রথের রশির প্রকাশকাল ১৯৩২। ১৯৩০-এ এম এন, রায় [১৮৮৭-১৯৫৪] ভারতে ফিরে আসেন। ঐ বছরে

প্রকাশিত হয় বুদ্ধদেব বসুর [১৯০৮-১৯৭৪] বন্দীর বন্দনা কাব্যগ্রন্থ। ভারতীয় কমিউনিস্ট দল তৃতীয় আন্তর্জাতিক শাখাভুক্ত হয় ১৯৩০-এ। ১৯৩২ এ প্রকাশিত প্রেমেন্দ্র মিত্র [১৯০৪-১৯৪৪] এবং বিভূতিভূষণের [১৮৯৪-১৯৫০] যথাক্রমে 'প্রথমা' ও 'অপরাজিত' গ্রন্থদ্বয়।

দেখা যাচ্ছে, উপন্যাস অপেক্ষা নাটকেই রবীন্দ্রনাথ বস্তুবাদী চিন্তা-ভাবনা স্পষ্ট প্রকাশ করেছেন। তাঁর উপন্যাসে সামন্ত ও বুর্জোয়া শ্রেণী চিত্র-চরিত্রই প্রধান। তাদের বিবর্তন দেখিয়েছেন, পরাধীন জাতির মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত আর বুর্জোয়া চেতনার মাধ্যমে। তাঁর উপন্যাসের চরিত্র এবং থীম শ্রেণীদ্বন্দ্ব এড়িয়ে আকস্মিক ভাবেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠে উদার চেতনায় সমৃদ্ধ মানবাত্মার প্রতীক রূপে। অনেকটা যেন বিশ্বজনীন। বস্তুবাদীর কাছে এই পরিণতি কাম্য। যদিও তা শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমেই সম্ভব বলে বস্তুবাদী বিশ্বাস করে। যেটা নাটকে দেখা যায়। অভিজিৎ কিংবা রঞ্জন সংগ্রামী মানসিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, মকররাজের নব-জীবন লাভ [পরিণতি বলা হয়নি নাটকে] শ্রেণী দ্বন্দে অংশ গ্রহণ করে। রথের রশিতে শোষকের পরাজয় শোষিতের হাতে চালিকা শক্তি অর্পণ করে। উপন্যাসে এটা হয়নি। এটা কি নিখিলেশ-গোরা-অমিত কোনও পেশায় যুক্ত নয় বলেই? উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ শ্রেণীসংগ্রাম এড়িয়ে গেলেন এদের বেকার রেখে।

রবীন্দ্র-প্রবন্ধে বস্তুবাদের পরিচয় দিতে প্রথমেই উল্লিখিত হয় 'রাশিয়ার চিঠি'। বস্তুবাদের প্রয়োগ ও প্রতিক্রিয়া দেখান হয়েছে এতে। রবীন্দ্রনাথ মুক্ত মনের পরিচয় দিয়েছেন বস্তুবাদের প্রয়োগ মূল্যায়নে। এও বাহ্য। প্রধান কথা হলো ভ্রমণ এবং তার ইতিহাস। ১৯৩০-এ বার্লিনে শিক্ষাবিদ লুনাচারস্কি রবীন্দ্রনাথকে রুশ ভ্রমণে আমন্ত্রণ জানান। সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে কবি ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০-এ মস্কো পৌঁছন। কিন্তু তার আগে ১৯২৬ ও ১৯২৯-এ রবীন্দ্রনাথ রুশ দেশ ভ্রমণের জন্য আমন্ত্রণ পান। তখন বলা হয়েছিল কবি অসুস্থতার জন্য রাশিয়ায় যেতে পারেন নি। তাই কি? ১৯৩০

এর একটি খবরে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথকে রুশ ভ্রমণ বাতিল করতে তাঁর কিছু বন্ধু এবং বৃটিশ প্রশাসক পরামর্শ দিয়েছিলেন। ভ্রমণের প্রাক্‌-কালেও তারা হাল ছাড়েন নি। ১৯৩০ সালের ১লা নভেম্বরের লিটেরারী ডাইজেস্ট পত্রিকা লেখে—"রুশ সরকার রবীন্দ্রনাথকে একজন উৎসাহী প্রচারক রূপে পাবে।" আসলে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বস্তুবাদী রুশ যতই স্পষ্ট হয়েছে, ভাববাদী এবং রক্ষণশীল সমাজ কবিকে ততই রাশিয়ার কাছ থেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করেছে। বিবর্তনের অন্তর্নিহিত সত্যই হলো, পরিণতিকে রোধ করা যায় না। এই পটভূমিতে রাশিয়ার চিঠি উজ্জ্বলতর।

ছোট গল্পকে আধুনিক সমাজ ও জীবনের ফসল বলা হয়। এর চরিত্র রবীন্দ্রনাথ কবিতায় ধরেছেন এইভাবে—

ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল;
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু'চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ ;
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।

তবুও ছোট গল্পে তত্ত্ব থাকে। তির্যক ভাবে। এ-যেন জানালা দিয়ে আসা একফালি রোদের ছটা। ঘরের সবটা উদ্ভাসিত হয় না। কিন্তু যেটুকু হয় বেশ উজ্জ্বলভাবেই হয়। পদ্মাতীরের জনজীবনের সবটাই কবির দেখা হয়নি। তবুও, দুঃখ-বেদনা, আনন্দ, অশ্রু, বঞ্চনা, নীচতা এবং শোষণের চিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। শহুরে জীবন এবং নর-নারীর প্রেমও আছে তাঁর ছোট গল্পে। সব মিলিয়ে বলতে হয় সাধারণ জীবনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার দলিল এই ছোট গল্প। তাঁর শেষ জীবনের কবিতার ব্যাখ্যা বহুক্ষেত্রে এই ছোট গল্প।

মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত হিন্দু বাঙালী সমাজে নারীর মূল্য পণ-প্রথার

মর্মান্তিক চিত্র আছে 'দেনা পাওনা' গল্পে। নিরু যখন বলে, "আমি কি কেবল একটা টাকার থলি..." তখন প্রতিবাদী নারী চরিত্র আত্ম-প্রকাশন করে। স্মরণীয়, রবীন্দ্রনাথকেও আপন কন্যার বিবাহে পণ দিতে হয়। যদিও সমাজে নারীর আসল মূল্য ধরা পড়ে রায়বাহাদুর মহিষীর ছেলেকে লেখা পত্রে—'বাবা, তোমার জন্য আর একটি মেয়ের সম্বন্ধ করিয়াছি, অতএব অবিলম্বে ছুটি লইয়া আসিবে'। নেত্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। পিতা-মাতা তাকে স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ দেয় নতুন বিবাহ-সংবাদের মাধ্যমে!

'ছুটির' ফটিক আর 'পোষ্টমাষ্টারের' রতন তুজনেই প্রায় সমবয়সী। এই বয়সে কোন কিশোরের মুখে, "আধো আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথা মানেই প্রগলভতা।" যদিও কিশোরীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হয় অন্যরকম। কিন্তু পিতার নিরাপত্ত-মূলক স্নেহচ্ছায়া না পেলে এই সমাজ যে শোষণ ছাড়া আর কিছুই দেবেনা, তা তুটি গল্পেই স্পষ্ট।

'বিচারক' গল্পের বিচারক মোহিতমোহনের পূর্ব ইতিহাস বর্ণনা করে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন,—"কিন্তু এককালে তিনি একাধিক রমণীর প্রতি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া আজ রমণীর সর্বপ্রকার সামাজিক অপরাধের কঠিনতম দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন।" গল্পটিতে মূলতঃ আছে বাঙালী হিন্দু-বাল-বিধবার করুণ পরিণতির কথা। মধ্য ও উচ্চবিত্ত হিন্দু-বাঙালী বাল-বিধবার প্রেম সমস্যা একটা অর্গলহীন বৃত্ত। ঘুরে ফিরে পূর্ব স্থানে ফিরে আসা। শরৎচন্দ্রের লেখায়ও এ সমস্যা বহুভাবে আলোচিত হয়েছে। বিচারক গল্পের বাল-বিধবার প্রেম সমস্যা এবং পরিণতি নির্মমভাবে দেখিয়েও কাহিনীতে একটি স্নিগ্ধ এবং তাৎপর্য মণ্ডিত সমাপ্তি দেখা যায়। আংটি হাতে মোহিত-মোহনের নব উপলব্ধির ফলাফল জানতে আমাদের তীব্র আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থেকে যায়। এই চারিত্রিক স্নিগ্ধতা 'বড় আমি'র চির অন্বেষক রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য। যদিও সমাজ কিংবা সমস্যা কিছুমাত্র উপেক্ষিত হয় নি। 'মেঘ ও রৌদ্র', 'কাবুলিওয়ালা', 'রাসমণির ছেলে' কিংবা

'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' তে পাই এই সমাজ চেতনা। অপর পক্ষে আধুনিকতা এবং জীবন চেতনার পরিচয় প্রকটিত 'রবিবার' 'শেষকথা' এবং 'ল্যাবরেটরি' ও অন্যান্য গল্পে।

রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র, গান্ধীজীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাব থেকে স্পষ্ট হয়। গান্ধী সত্যাগ্রহী। তাঁর সেনারা বয়কটের হাতিয়ার নিয়ে আইন অমান্য করে। হাতিয়ার ব্যবহৃত হয় অহিংস পন্থায়। আছে প্রেম আছে ত্যাগ। কিন্তু ব্যক্তি মানুষ মূর্ত নয়। রেজিমেন্টেড। শান্তিনিকেতনে অতিথি গান্ধীজী আলপনা মণ্ডিত ধূপ সুরভিত গৃহকোনটি ছেড়ে সেই যে ছাদে আশ্রয় নিলেন সেওতো এই মানসিকতার জন্য। গৃহকর্তার আপ্যায়ন অগ্রাহ্য করাটা দৃষ্টিকটু বৈকি। তাই, গান্ধীজী কোনদিনই রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ সমর্থন পাননি। অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমী সামন্তবাদী চিন্তা অতিক্রম করে, বুর্জোয়া মূল্যবোধ পিছনে ফেলে, আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী এক মানবপ্রেমীরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন। কি জানি কী শক্তি অথবা কোন পুণ্যের বলে? এরপরও বস্তুবাদী কবিকে বলছি না। কবির বিশ্বমানবিকবাদ বাঙালীর চিন্তায় আলোড়ন আনে। যাকে তুলনা করা চলে ভূকম্পনের ব্যাপকতা আর আগ্নেয়গিরির ঊর্ধ্বগামীতার সঙ্গে।

স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সংগীত কিংবা চিত্রে উল্লেখযোগ্য উত্তরাধিকার বাঙালী পায়নি। পায়নি দেশ শাসনের স্থায়ী তেজ। বাঙলা ছিল আর্যাবর্তের কাছে একদা আন্দামান মূল ভূখণ্ডের কাছে যা তাই। সেই বাঙালীর মনীষা, সাহিত্য-সংগীত চিত্রে এককথায় সুকুমার কলায় বিস্ময়কর শক্তি নিয়ে বিস্ফোরিত হলো, এই উনিশ আর বিশ শতকে। তার পুরোহিত রবীন্দ্রনাথ। ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথকে জাপান থেকে লিখেছেন,—"আমাদের নব-বঙ্গের চিত্রকলায় আর একটু জোর সাহস আর বৃহত্ত্ব দরকার···আমরা অত্যন্ত ছোটোখাটোর দিকে নজর দিয়েছি।"

সাগরপাড়ি দিলে যে-জাতের জাত যায়, বৃহত্ব তার কাছে সহজে

আসেনা। এই সংস্কার যেদিন ভাঙ্গবে, জোর আসবে সেদিন। রবীন্দ্রনাথ সেই সংস্কার ভাঙ্গার কাজটা করেছেন সর্বত্রভাবে। চিত্রকলা সঙ্গীত সাহিত্যে জোর আনলেন, সাহস জোগালেন। অসঙ্কোচে সমাজ-চিত্র তুলে ধরলেন। কিন্তু অশ্লীলতা কোথাও প্রকাশ পায়নি। যেটা এখন বাস্তবতার সমার্থক মনে করেন কেউ কেউ।

তিনিই নৃত্যকলাকে শিষ্টজনগ্রাহ্য করেন। অভিনয়ের মাধ্যমে নারীর জীবনে আনলেন আঙ্গিনা প্রসারণ। অবশ্যই মর্যাদা বজায় রেখে। [নৃত্যে উদয়শংকর এবং চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ রায় এর স্থায়ী রূপকার। মঞ্চে এ-কাজ করেছেন শিশির ভাদুরী।] সঙ্গীতকে বাঙালী জীবনের স্থায়ী ভিত্তি করলেন তিনিই। অনেকেই তাদের সাধনার মাধ্যমে এটা ধরে রাখায় প্রচেষ্টায় রত। সুকুমার কলা বাঙালী জীবনের মূল্যবোধ পাল্টে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তার প্রেরণাদাতা। প্রগতির তিনি পথ প্রদর্শক। যদিও তিনি ছিলেন অদ্বৈতবাদী, তাঁর সৃষ্টি তাই ভাববাদ প্রভাবিত। বস্তুবাদীরা যাকে প্রগতি সাহিত্য বলেন তিনি তার জনক নন। কিন্তু বস্তুবাদী সাহিত্য তাঁর দ্বারা পুষ্ট হয়েছে, প্রভাবিত হয়েছে এবং প্রেরণা পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে প্রগতি তথা বস্তুবাদী সাহিত্য বিকাশ ত্বরান্বিত করেছেন। কিছুটা সহজও করে দিয়েছেন বস্তুবাদীদের কাজ।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য, 'কবি-কাহিনী'। প্রকাশকাল ১৮৭৮। কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় "শেষ লেখা।" 'জন্ম-দিন'কে কবির শেষ কাব্যগ্রন্থ বলা যায় অন্য অর্থে। মৃত্যুর পূর্বে প্রকাশিত এটি তাঁর শেষ কাব্য গ্রন্থ। ১৯৪১ সালে প্রকাশিত। ১৮৭৮ থেকে ১৯৪১—সময়ের ব্যাপ্তি ৬৪ বছরের। তিনি তাঁর ৮১ বছরের জীবনে ৬৪ বছরই সৃষ্টির কাজে ব্যয় করতে পেরেছেন। ঈর্ষা করার মতই ঘটনা বটে।

কবির লেখায় ভাব, দর্শন, সৌন্দর্য্যচেতনা, সমাজচেতনা, বিশ্ব-চেতনা এবং মানব প্রীতি নানাভাবে এসেছে। "বৈরাগ্য সাধনে

মুক্তি সে আমার নয়" এ-কথা মায়াবাদ ভাববাদ তথা পরাতত্ত্ব বিরোধী। তবুও তিনি বস্তুবাদী নন। 'সৌন্দর্য চেতনা' মানব জীবনে কিছুমাত্র অবহেলার ধন নয়। এই সৌন্দর্যের প্রতি কবির আত্যন্তিক টানই তাঁকে সাধারণ মানুষ থেকে দূরে রেখেছে হয়তো বা। অসীমের প্রতি কবির মোহময় আকর্ষণ পরা বাস্তবতার মতই মনে হয়। তবু রবীন্দ্রনাথ আমাদের কেন? যারা আছে সবার নিচে সবার পিছে সব হারাদের মাঝে, রবীন্দ্রনাথ কেন তাদের আপন জন। তাঁকে নিজের একজন না-ভেবেও কেন মনে পড়ে অনুক্ষণ?

মানুষের প্রতি কবির ছিল গভীর মমতবোধ। অভুক্তের বেদনা খালিপেটে বোঝাননি। কিন্তু খালিপেটের সীমাহীন কাঁমড় একজন মমতাময়ী জননীর মত নিজের করে বুঝেছেন। সাধারণের প্রতি তাঁর দরদ প্রগতি সাহিত্যের ভূমিকা।

যদিও শেষের কবিতা কিংবা নৌকাডুবি প্রসঙ্গে প্রগতি সাহিত্যের আসরে কবির ভরাডুবি ঘটিয়ে দেওয়া যায় অবলীলায়। তবুও, কবির মানবপ্রীতির কথা সাঁওতাল পাড়ার দুন্দুভির মত, ডিম ডিম রবে বেজে চলবে অনন্ত কাল। স্মরণ করবে মানুষ সেই মন্ত্রসম অর্ধশ্লোক— 'মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ'। সক্রেটিসের মুখে আর একটি অর্ধশ্লোক উচ্চারিত হয়েছিল 'সত্তা' জিজ্ঞাসার প্রথম উষায় —'ভার্চু ইজ নলেজ'। [সততাই জ্ঞান] যদিও রবীন্দ্রনাথ উচ্চারিত অর্ধশ্লোককে দ্বিধাহীন ভাবে বলা যায় 'অধিকতর অর্থবহ'। ভাষার প্রতি টান দেখে ব্যক্তির মানসিকতা স্পষ্ট হয়। যেমন হয়েছে গৌতমবুদ্ধ কিংবা বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথ চলিত ভাষা ব্যবহার করে এবং কাব্যে গদ্যছন্দের প্রয়োগ করে, জনতার কাছাকাছি থাকতে চেয়েছেন বলা যায়।

বাঙালীর প্রতি, বাংলাভাষার প্রতি কবির মমতা, তাঁকে ভারতীয় হতে বাধা দেয়নি। যেমন বাধা হয়নি বিশ্বমানব হওয়ার ক্ষেত্রে ভারতীয়ত্ব। দূর বিদেশ থেকে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি কোন থেকে ভারত-দর্শন রবীন্দ্রনাথের অসীম সৌভাগ্য। বিপরীত ক্রমে ভারতের

প্রতিটি কোন থেকে বিশ্ব অবলোকনের দুর্লভ সুযোগও তাঁর ঘটেছিল। ফলে তাঁর দেখাটা হয়ে উঠেছিল অর্থবহ এবং সার্থক। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে বাঙালী জাতীয়তাবাদকে গ্রহণ করেছিল ধর্মবিশ্বাসের মতই। কবির কাব্য-চিত্র-সংগীত-শিল্পে এ পরিচয় স্থায়ী হয়ে আছে। স্থাপত্যে এটা ঘটেনি। শান্তিনিকেতনে গেলেই এটা আর বলে দিতে হয় না। ভাস্কর্যও রবীন্দ্র স্পর্শে তেমন প্রভাবিত হয়নি। যদিও রামকিঙ্কর বেজের প্রতি তাঁর প্রশ্রয়ে কবির ভাস্কর্য মানসিকতার প্রবণতা ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গ সংস্কৃতির একটা স্থায়ী রূপরেখা টেনে দিয়েছেন। একে তাৎক্ষনিক বা সমকালীন ভাবলে ভুল হবে।

শরৎচন্দ্র

বেদনার শরিক বিশ্লেষণে বিমুখ

রবীন্দ্রনাথের সমকালেও শহরে বুর্জোয়া প্রাধান্য ছিল কিন্তু গ্রাম-জীবন চালিত হতো সামন্তবাদী ধ্যানধারণায়। নারীকে পণ্য করা হয়েছে। পুঁজির দাপট সর্বত্র। আবার পুঁজির জন্য হাহাকারও সবার মধ্যে। প্রতিযোগিতা চলছে বিকোবার। কে কীভাবে নিজেকে পণ্য করবে এবং কী করে সর্বাধিক মূল্যে বিক্রী হবে তার প্রতি-যোগিতা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যাকে ঘুষ দিতে হয়' গল্পটি এই মানসিকতার উজ্জ্বল উদাহরন। মানুষ একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। সকলেই পুঁজি সমর্পিত প্রাণ। তার যে অন্য মানুষের সঙ্গেও একটা সম্পর্ক আছে, সমাজের প্রতি কর্তব্য আছে এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির কাছেও কিছু ঋণ আছে, বুর্জোয়া এ-কথা ভুলে যায়। এদের কথা শোনার প্রত্যাশা ছিল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের [১৮৭৬-১৯৩৮] কাছে। এ-প্রত্যাশাও ছিল, সমসাময়িক বুর্জোয়া জীবন তিনি তাঁর সাহিত্যে উপজীব্য করবেন।

বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসই সম্ভবতঃ সর্বাধিক পঠিত। নিশ্চয় এমন কোন প্রসাদগুণ আছে শরৎচন্দ্রের লেখায়, যা পাঠক সম্মোহনের কারণ হয়েছে। তাঁর পাঠকও বুর্জোয়ারাই!

শরৎ-সাহিত্যের প্রধান গুণ তার সাবলীল ভঙ্গী, ঘটনার নাট-কীয়তা এবং উক্তি প্রত্যুক্তিময় সংলাপ। উপন্যাসে যা কদাপি দেখা যায়। ভাষার সারল্য শরৎচন্দ্রের আর একটি অলঙ্কার। শরৎচন্দ্র কিন্তু বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের কথা তেমন বলেন নি। হয়ত, বুর্জোয়া প্রতিচ্ছবি দেখতে ভয় পায়, এটা তিনি জানতেন। রবীন্দ্রনাথ দু-ধাপ অতিক্রম করে বিশ্ব-জনীনতায় পৌঁছে গেলেন। কল্পনার ধন বাঙালী গ্রহণ করল বিস্ময় বিমুগ্ধ চিত্তে। রবীন্দ্রনাথের মুখোমুখি হলে বাঙালী হয় বিস্মিত। বিমুগ্ধ। শরৎচন্দ্রের সামনাসামনি হলে সেই বাঙালীই হয় আলাপচারী। মোহময়। এর কারণ, শরৎচন্দ্র বিবর্তনের একধাপ আগের সামন্ততান্ত্রিক সমাজকে উপস্থিত

করেছিলেন তাঁর উপন্যাসে। সেটা ছিল বুর্জোয়া বাঙালীর ফেলে আসা গ্রাম জীবনের শৈশব স্মৃতি। যে গ্রামে তাকে আর থাকতে হবে না কিন্তু ছুটীর অবসরে, বিনোদনের জন্য স্মৃতি রোমন্থন মন্দ কি? শরৎ সাহিত্যে বাঙালী এটা পায়। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে।

তিনি গফুর জোলাকে কিশোরী মেয়ের হাত ধরে গ্রাম ত্যাগ করিয়েছেন। পাঠিয়েছেন জুট মিলে। বানিয়েছেন তাকে শ্রমিক। শ্রমিক জীবনের বিকল্প কিছু গফুরের ছিল না। বস্তুতঃ সময়টাই তো কারখানা কেন্দ্রীয় ছিল। কৃষি নয় মিলই টানবে মানুষকে। গল্পের এই আকস্মিক মোচড় চমৎকার। কিন্তু এ-ধরনের পরিনতি শরৎচন্দ্র খুব বেশী দেখান নি। সন্দেহ নেই 'মহেশ' শরৎচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প। বাংলা সাহিত্যের এই ধারাটি, সামন্ত প্রথার অবসান, শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুদয়—এই প্রবাহেরই পরিণতি প্রতিবাদী তথা পূর্ণ বস্তুবাদী সাহিত্য।

শরৎচন্দ্রের জীবন ঘটনা বহুল। অভিজ্ঞতা বিচিত্র। তা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর সাহিত্য কর্মে। বস্তুবাদী সাহিত্য তাঁর কাছেও ঋণী। উল্লেখ করা যায় শাহজী-অন্নদাদিদি উপ্যাখ্যান। স্মরণীয়—শরৎচন্দ্র তাঁর ভাগলপুর বসবাসের সময় দীর্ঘদিন সাপুড়েদের সঙ্গে অতিবাহিত করেছেন। পরবর্ত্তীকালে এই অভিজ্ঞতা, জেলেদের নিয়ে, ঘটেছিল ঔপন্যাসিক সমরেশ বসুর। গঙ্গা উপন্যাসে আছে তারই প্রতিফলন।

১৮৭৫-এ স্বামী দয়ানন্দ আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। একবছর পর, ১৮৭৬-এ শরৎচন্দ্রের জন্ম। আর্থিক কারণে শরৎচন্দ্র মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন। এফ. এ. পড়ার সময় কলেজ ছেড়ে দেন। জীবিকার জন্য যান রেঙ্গুনে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের পটভূমি তাই দেশান্তরে প্রসারিত। তুলনীয় তিনি দস্তয়ভস্কির সঙ্গে। এশিয়ার সাইবেরিয়া থেকে রুশের মস্কো পর্যন্ত দস্তয়ভস্কির উপন্যাসের বিস্তার। রেঙ্গুনের-অডিট অফিসে শরৎচন্দ্র একটি করনিকের চাকুরী পান। সমাজ বিমুখকতার মধ্যে তাঁর প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হতে পারত।

তিনি বস্তুবাদী বাস্তবতার ভঙ্গীতে প্রতিবাদী সাহিত্য রচনা করতেও পারতেন। কিন্তু পারিবারিক জীবন-কথাই তিনি বলেছেন কথকঠাকুরের মত। 'পল্লীসমাজ' থেকে শরৎচন্দ্রের প্রশ্নের সূচনা। 'শেষপ্রশ্নে' তার সমাপ্তি। আরো দুটি জরুরী জানার কথা আছে শরৎ প্রসঙ্গে। তিনিই বাংলা সাহিত্যে প্রথম ঔপন্যাসিক, যিনি রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। রাজ্য কংগ্রেস কমিটির তিনি ছিলেন অন্যতম সহ-সভাপতি।

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কর্মবহুল জীবনের পরিসমাপ্তি ১৯১৪ সালে। "পল্লীসমাজ" উপন্যাসের প্রকাশ ১৯১৬ সালে। ১৯.৬তেই রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'বলাকা' কাব্য, 'ফাল্গুনী' নাটক এবং 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসটি। ঐ বছরেই কবি সমর সেনের জন্ম।

প্রচলিত নীতিবোধ নিয়ে শরৎচন্দ্র প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ সামাজিক কুপ্রথাগুলির সংস্কার চেয়েছিলেন। আমূল পরিবর্তন চাননি। তাঁর প্রশ্ন এবং চাওয়া দুটোই বস্তুবাদী সাহিত্য বিকাশে সহায়তা করেছে। তা'বলে তাঁকে বস্তুবাদী বলা যাবেনা। বস্তুবাদী শুধু প্রশ্ন করেনা—কাজও করে এবং বস্তুবাদী সংস্কার চায়না, চায় আমূল পরিবর্তন। বৈধব্যের সংস্কারের মোহে তিনি আচ্ছন্ন কিন্তু বিধবাদের অবশ্য মান্য বিধিনিষেধ সম্বন্ধে তিনি সন্দিহান। এই সন্দেহের প্রকাশ পল্লী সমাজের 'রমা' চরিত্রে।

শরৎচন্দ্রের মধ্যে বস্তুবাদী মনস্কতা নেই। নেই বস্তুবাদী চরিত্র। যেটা আমরা এর পড়েই পাব তারাশঙ্করের মধ্যে।

অথচ ১৯১৯-এ বাঙালীর ছেলে এম. এন. রায় সুদূর মেক্‌সিকোতে এল, পার্টি ডো কমিউনিস্টা ডি মেক্‌সিকো নাম দিয়ে কমিউনিস্ট দল প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতে রাওলাট অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হলো। হলো জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড। এলো মণ্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার। সাম্যবাদের প্রভাব তখন ভারতে দেখা যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠিত হলো নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চলছে স্মলনি ইনষ্টিটিউটে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অধিবেশন।

১৯২০-তে শরৎচন্দ্র লিখলেন গৃহদাহ উপন্যাস। সমাজ যখন, বিবেকানন্দের ভাষায়, আর 'জ্যান্ত' থাকে না, তখন দরকার প্রচলিত নীতিবোধকে আঘাত করা। গৃহদাহে সেটা পেলাম। বিবাহিতা নারীর প্রেমের তীব্র উন্মাদনা অচলার মধ্যে দেখা গেল। তার দাহ চরিত্রহীনের কিরণময়ীর মধ্যে। অচলা এবং কিরণময়ী স্বামীর উপস্থিতিতেই পর-পুরুষে আসক্ত। গৃহবন্দী নারীর বিদ্রোহ? এদিক থেকে এ হলো গৃহকোণ-বিপ্লব। সমাজের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেওয়ার পল্লী-গীতি এটা। তবুও, খাঁটি বস্তুবাদী চিন্তা প্রভাবিত নারী-মন-বিপ্লবের গণসঙ্গীত এ নয়। প্রেমের সার্থক পরিণতি শরৎচন্দ্র দেখাতে পারেন নি। অচলা সমাজ ছেড়ে বহুদূরে গিয়ে বাঁচতে চাইল আর কিরণময়ী তো উন্মাদিনী হয়ে গেল। তবু এরা প্রতিবাদ করল। বাঙালী জীবনের কূপমণ্ডূকতা এবং স্বভাব বিরোধী নীতিবোধ ভেঙ্গে দিল এরা। পরবর্তী কালে সমাজে এদের প্রতিষ্ঠিত করতেই আসবে বস্তুবাদী সাহিত্য। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজে।

প্রচলিত মূল্যবোধ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র সংশয়ী। পল্লী জীবনের নীচতা দেখে তাঁর অন্তর ক্ষত বিক্ষত। তিনি চান পরিবর্তন! হিন্দু বাঙালী বিধবার সমস্যার প্রতিকারও তিনি চান। যদিও বিবাহিত জীবনের সমস্যা সমাধানে খুঁজে পান বিবাহকেই। গৃহ ভেঙ্গে ফিরে আসেন সেই গৃহেই।

অভয়ার স্বামী তাকে ত্যাগ করে সুদূর রেঙ্গুনে চলে গেছে। অভয়া স্ত্রীর দাবী নিয়ে তার কাছে রেঙ্গুনে আসে। স্বামীর সঙ্গে কয়েকদিন বাস করার পর অভয়া প্রহৃতা হয়। তাকে গৃহত্যাগে বাধ্য করা হয়। অভয়া কাঁদে নি। সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে এই অত্যাচারের জবাব দেয়। দ্বিতীয় বিবাহ এখানে প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের ভাষা। বিবাহ সমাজ গঠনের জঙ্গী হাতিয়ার। পরিবার এই বিবাহের দান। পরিবার ধরে রাখে সমাজ। অভয়া বাংলা সাহিত্যে বস্তুবাদী নারী চরিত্রের প্রথম ভেরী বাদিকা। গফুর জোলা এবং অভয়া এ-দুটি খাঁটি বস্তুবাদী চরিত্র। এরা হার মানে না। এদের জীবনী শক্তি অদমনীয়।

এ দুটি চরিত্রের জন্য বস্তুবাদী সাহিত্যের ইতিহাসে শরৎচন্দ্র চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। কিছু কিছু সামন্তবাদী চরিত্রও তাঁকে স্মরণীয় করবে।

দেনাপাওনা'র জীবানন্দের মধ্যে যে সামন্তবাদী-চেহারা তিনি দেখিয়েছেন তারও প্রয়োজন ছিল। জমিদারী ব্যবস্থায় শোষকের চেহারা এতে ফুটে উঠেছে। দুলে বাগদীদের কথা, অন্ত্যজ শ্রেণীর জীবন-যন্ত্রণা, তাদের দিন-যাপনের গ্লানি, শরৎচন্দ্রই এনেছেন বাংলা সাহিত্যে। কাঙ্গালীর মা এদেরই প্রতিনিধি। কাঙ্গালীর মা চেয়েছিল হিন্দু-উচ্চবর্ণের গৃহবধূর মতই তারও যেন মুখাগ্নি সহকারে সৎকার হয়। মায়ের সেই ইচ্ছা পূরণের চেষ্টায় উচ্চবর্ণের কাছ থেকে কাঙ্গালীর মর্মান্তিক অপমানের কাহিনী তিনি বর্ণনা করেছেন। মৃত্যুর পর হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেই বোধহয় এই বর্ণ চেতনা কাজ করে না 'অভাগীর স্বর্গ', বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্তের নারকীয় মানসিকতার চিত্র।

শরৎচন্দ্র দুঃখের কথা বলেছেন, দুঃখীর কথাও বলেছেন। উপেক্ষার কথা বলেছেন আবার উপেক্ষিতের কথাও বলেছেন। হিন্দু উচ্চবর্ণের জড় জীবন তিনি প্রকাশ করেছেন। নিম্নবর্ণের প্রতি অত্যাচারের কাহিনী আমাদের বেদনায় মথিত করে। অশ্রু ঝরায় কিন্তু রুখে দাঁড়াতে উৎসাহ দেয় না। প্রতিবাদের ভাষা তিনি ব্যবহার করেন নি। সমাজ পুনর্গঠনের মন্ত্র তা নয়। ব্যতিক্রম আছে। সামান্য হলেও তা অবহেলার নয়। ঐ পথেই বস্তুবাদী সাহিত্য আসবে। তিনি বাস্তবতার অগ্রগামী সৈনিক।

১৯৩৯-এ মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্রের শেষ উপন্যাস, শেষের পরিচয়-এর প্রকাশ। বিপ্রদাস [১৯৩৫] তাঁর জীবৎকালের শেষ উপন্যাস। মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা হয় ১৯২৪-এ। ১৯২৫-এ ইহলোক ত্যাগ করলেন ডঃ সান-ইয়াৎ-সেন [১৮৬৭—১৯২৫] এবং চিত্তরঞ্জন দাশ [১৮৭০—১৯২৫]। ১৯২৬-এ শরৎচন্দ্র লেখেন পথের দাবী। কল্পিত রাজনীতির কাহিনী ছাড়া রাজনৈতিক কর্মী শরৎচন্দ্র রাজনীতি উপজীব্য বড় কোন লেখাই লিখলেন না। আর যা লিখলেন তার

বিষয়বস্তু ছিল তাঁর দলের [কংগ্রেসের] ঘোষিত নীতির পরিপন্থী। একজন সচেতন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী কেন যে তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে রাজনীতি রাখলেন না, তা ভেবে আমরা বিস্মিত হই। অথচ শরৎচন্দ্রের উপন্যাস সৃষ্টির ভরা জোয়ারেই তো বড় বড় রাজনৈতিক ঘটনাগুলো ঘটল। তিনি দীর্ঘদিন ব্রহ্মদেশে বসবাস করেছেম। চীনের ঘটনা তাঁর কাছে মোটামুটি উপেক্ষিতই থেকে গেল। বলছি না চীনকে নিয়ে উপন্যাস লিখতে হবে। কিন্তু তাঁর উপন্যাসের কোন চরিত্রেও তার প্রভাব থাকবে না ?

না-পাওয়ার বেদনা থাকতেই পারে। তাই বলে তা নিয়ে হা হুতাশ করা অর্থহীন। শরৎচন্দ্র পল্লীবাস্তবতা, নারীর [হিন্দু] সমস্যা এবং সামন্তজীবনের সহৃদয় বর্ণনা দিয়েছেন। তার মধ্যে বাস্তবতাও ছিল। যদিও তা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা নয়। তিনি জীবনদরদী কিন্তু প্রতিরোধী নন। সাধারণে সমর্পিত চিত্ত, অতীত-মুগ্ধ স্মৃতিচারী। বর্তমান বিমুখতার অভিযোগও অর্থহীন। তিনি সমকাল বিমুখও নন। তার স্বরূপ সম্বন্ধে অনবহিত। পথের দাবীতে তাই কল্পিত প্রতিবাদের নির্দেশ দিলেন, যে-পথে প্রতিকার অসম্ভব। তবুও তিনিই সেই কথক, যিনি বস্তুগত মানস নিয়ে গ্রাম দেখেছেন এবং তা আমাদের জানিয়েছেন।

মনে হয় বাস্তবজীবনে তিনি প্রেম-ভালোবাসা-দরদ থেকে বঞ্চিত। কিন্তু তিনি তাঁর দরদ, প্রেম এবং ভালোবাসা থেকে কাউকে বঞ্চিত করেননি। হৃদয়ে হৃদয় যোগের প্রশ্নে তিনি ফাঁকি দেননি। ভালোবাসা দিয়ে যতটা দেখা যায় তিনি দেখেছেন, দেখিয়েছেন। বিশ্লেষণ না করলে বিচারে না বসলে যা পাওয়া যায়না, শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে বাঙালী তা পায়নি।

তারাশঙ্কর

দোলাচল কিন্তু বাস্তববাদী

সমকাল কতটা এবং কী ভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের [১৮৯৮-১৯৪৪] লেখায়, তা জানা আমাদের কাছে খুবই জরুরী। বাস্তব সাহিত্যের অপরিহার্য লক্ষণ হলো সমকালের প্রতিফলন। বস্তুবাদী সাহিত্যে এই প্রতিফলন প্রতিবাদী এবং প্রয়োজনে প্রতিকারী হয়ে উঠে। সাহিত্যে তৃতীয় মাত্রা যুক্ত হয় যুগ রুচি পরিবর্তিত করে দিতে পারলে। এ রকম ঘটলে লেখক হন যুগন্ধর। তারাশঙ্করের মানসলোক এবং তাঁর ব্যক্তি-রুচিও আমাদের জানা দরকার। কেননা, তিনি বাংলা উপন্যাস রাজ্যের অন্যতম প্রধান পুরুষ!

তারাশঙ্কর ত্রিশের দশকে লেখা শুরু করেন। চল্লিশের দশকে তারাশঙ্কর ছিলেন সাম্যবাদী শিবিরের খুব কাছাকাছি। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা তাঁর লেখায় প্রত্যাশিত ছিল। প্রত্যাশা অপূর্ণ থেকে গেছে। বস্তুগত বাস্তবতা কিংবা উদ্দেশ্য প্রণোদিত বাস্তবতাই তিনি এনেছেন লেখায়। ধাত্রীদেবতা উপন্যাস এবং আত্মজীবনীতে তিনি তাঁর আত্মিক সংকটের পরিচয় দিয়েছেন। কন্যা বুলুর মৃত্যুশোক তাঁকে যারপর নাই শোকাহত করে রেখেছিলো উত্তর জীবনে। মৃত্যু তারা শংকরের কাছে ভীতিউদ্রেককারী। অমোঘ। মানুষ অসহায়। মৃত্যু ভয়কে তারাশঙ্কর, রবীন্দ্রনাথের মত, কখনোই উপেক্ষা করতে পারেন নি। মৃত্যু জীবনের পরিপূর্ণ রূপ এটা তিনি মেনে নিতে পারেন নি। যে সংগ্রাম সমষ্টির তাকে তিনি ব্যষ্টির সংগ্রামে পরিণত করেছেন। তিনি একবার কাশীবাসী হওয়ার জন্য সেখানে গিয়েও আবার গৃহে ফিরে আসেন।

১৯৬০-এ তারাশঙ্কর বলেন, "এই আশ্চর্য মানববন্ধুটি [লেনিন] আজও আমার পথ-প্রদর্শক"। তিনি ১৯৪০-এ প্রতিষ্ঠিত অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট রাইটার্স অ্যাণ্ড আর্টিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তারাশঙ্কর এই প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় সভাপতি। একদা

মতবিরোধের কারণে তিনি এর অধিবেশন ত্যাগ করে চলে যান। আবার ফিরেও আসেন। তারাশঙ্কর শ্রেষ্ঠ বস্তুবাদী ঔপন্যাসিক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান গুণগ্রাহী।

১৯২৭ সাল। বুদ্ধদেব বসুর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হলো প্রগতি পত্রিকা। ঐ বছরই কবি টমাস স্টার্নস এলিয়ট ব্রিটিশ নাগরিকতা নেন। ১৯২৮-এ অতিবাম বলে উল্লিখিত কমিনটার্ণের নবম সম্মেলন হয়। এই সময়ে জনমন আলোড়িত করে মহাপ্রয়াণ লাভ করেন যতীন্দ্র নাথ দাস। তিনি ব্রিটিশের কারাগারে তেষট্টি দিন অনশন করে দেহত্যাগ করেন। বাংলা সাহিত্যে এসবের প্রতিফলন হলো কতটা?

১৯৩২-এ আমরা নতুন নতুন কাব্যের প্রকাশ দেখলাম। বিষ্ণুদের উর্বশী ও আর্টেমিস এই বছরেই প্রকাশিত হয়। একটু আলাদা করে আমাদের মন টানে অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত লেখক রবীন্দ্রনাথ মৈত্র। মানময়ী গার্লস স্কুল উপন্যাসে তিনি উপহার দিলেন একটি স্বাবলম্বী নারী চরিত্র। এতদিন স্বাবলম্বী নারী চরিত্র মানেই তো ঝি কিংবা ঐ জাতীয় চরিত্র ছিল। মানময়ী গার্লস স্কুলে পেলাম এক শিক্ষিকাকে। ফ্যাসীবাদের সেই সর্বগ্রাসী রূপ তখন প্রকট। মনীষী অধ্যাপক অ্যালবার্ট আইনস্টাইন নিজেকে বাঁচাতে ১৯৩৩-এ দেশত্যাগ করেন। ভারতে, আন্দামানে রাজনৈতিক বন্দীরা অনশন করে মহান শহীদের মৃত্যু বরণ করলেন। প্রতিক্রিয়া সেই তিনিই দেখালেন - রবীন্দ্রনাথ যাঁর নাম। তিনি বিপ্লবীদের কাছে বার্তা পাঠালেন অনশন প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়ে। বন্দীদের সেটা যথারীতি জানতে দেওয়া হয়নি। নজরুলের অনশনের সময়েও এটাই ঘটেছিল।

এই পটভূমিকায় তারাশঙ্কর এলেন, 'চৈতালী ঘূর্ণি' নিয়ে। উপেক্ষিত কৃষকদের রক্ষা করবে কে? এত বড় মাপের প্রশ্ন নিয়ে তারাশঙ্করের আগে কথাসাহিত্যের অঙ্গনে আর কেউ প্রবেশ করেন নি। গ্রাম ভাঙ্গছে। চাষী এগিয়ে চলছে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে।

গণ-শোষণের সুপরিকল্পিত চক্রান্তের এই পরিণতি। যে-গ্রামে ছিলাম আমরা, যা ছিল আমাদের ধারণ করে, তার এই পরিণতির জন্য প্রস্তুতি ছিল না জনমনে। হয়তো দেখার চোখ আর দরদী মনের মানুষও ছিলনা। তারাশঙ্কর এই ভাঙ্গন প্রত্যক্ষ করলেন। অনুভব করলেন কলের দুর্দমনীয় টান এবং সহরের অর্থ শক্তি। তারাশঙ্কর অন্য প্রশ্নও তুলেছিলেন। ঈশ্বর কী এদের বাঁচাবেন? যদি বাঁচাবেন তো বাঁচাচ্ছেন না কেন? শোষিতের কাছে, 'ঈশ্বর সর্বশক্তিমান' এই আপ্তবাক্যে সন্দেহ দেখা দিল। তিনি গ্রামের মানুষের মনের কথা এইভাবে বললেন,—"বাঁচিলে দেবতার পূজা দেয়, না বাঁচিলে বলে, পাথর, পাথর, দেবতা ফেবতা মিছে কথা।···ভগবানকে উহারা মানে কি মানেনা সেটা আজ একটা অমীমাংসিত সমস্যা। ডাকিতেও মন চায়না আবার না ডাকিলেও মন খুঁত খুঁত করে।" তারাশঙ্কর কালবৈশাখীর পূর্বাভাষ নিয়ে এসেছিলেন। বস্তুবাদী পাঠক প্রকৃত বস্তুবাদী সাহিত্য সৃষ্টির সম্ভাবনায় উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলো। প্রতিশ্রুতি ছিল অবশ্যই। সমসাময়িক সমস্যা তাঁকে ভাবিয়েছে। 'মন্বন্তর' নিয়ে তিনি উপন্যাস রচনা করেছেন। সাঁওতাল বিদ্রোহ [আদিনা আন্দোলন—১৯৩২] তাঁকে 'অরণ্যবহ্নির' খোঁজে উৎসাহিত করেছে।

উচ্চবর্ণের সঙ্গে যখন শোষক শব্দটি সমার্থক হয়ে উঠেছে, তখন উচ্চবর্ণ-জাত তারাশঙ্কর নিম্ন বর্ণের কথা বলেছেন। তাঁর লেখায় একজন মানুষ মানেই একজন বাঙালী—একজন হিন্দু অথবা মুসলমান নয়। তারা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের নির্দিষ্ট মানুষটি। আঞ্চলিকতা বা আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্করের উল্লেখযোগ্য দান। তিনি আঞ্চলিক চিত্রের নিপুণ চিত্রকর। আঞ্চলিক চিত্রের মধ্যে আবার এসেছে নির্দিষ্ট শ্রেণী সমূহ। সঙ্গীতজীবী যে সম্প্রদায়গুলি—বাউল, বাজিকর, গায়ক এদের তারাশঙ্কর এনেছেন সাহিত্যে। এটা সম্ভব হয়েছে কারণ তারাশঙ্কর সঙ্গীত প্রেমী এবং সঙ্গীত রচয়িতাও। সাঁওতাল জীবন কথা—বাংলা সাহিত্যে তাঁর অনুপম সংযোজন।

তিনি তন্ত্রমন্ত্র প্রভৃতি সংস্কারে নাকি আগ্রহী ছিলেন। হয়তো এ কারণেই, তাঁর সাহিত্যে, তান্ত্রিক বীরাচারও উপেক্ষিত নয়।

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে এসবই নতুন মাত্রা যোজনা করেছে। এক সময় সাহিত্যের উপজীব্য ছিল দেবতার লীলা-কাহিনী। পরে এলো মানুষ কিন্তু সরাসরি নয়। অভিশপ্ত দেবশিশু মানব ঘরে জন্ম নিলে সেই দেব-মানব সাহিত্যের নায়ক হয়। তারপর মানুষ যখন এলো তখনো তার মধ্যে প্রকাশ করতে হয়েছে কল্পিত দেব-চরিত্রের অকল্পনীয় গুণরাশি। উচ্চবর্ণের মানুষেরা তো চিরদিনই দেবতার কাছের মানুষ বলেই বিবেচিত হয়েছে। তারাশঙ্কর বারে বারে তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষজন নিয়ে এলেন সাহিত্যে। শোষিত সমাজকে ঠিক তাদের মত করেই। প্রশ্ন হলো, এদের দিয়ে তারাশঙ্কর কী করলেন বা করালেন? এদের দিয়ে যদি প্রতিবাদ প্রতিরোধের একটা ঝড় বইয়ে দিতে পারতেন তো বস্তুবাদী সাহিত্যের শুরু হতো তখনি। মাণিকের জন্য অপেক্ষা করতে হতো না। পরিবর্তে তারাশঙ্কর প্রতিবাদের আর একজন শরিক হয়ে রইলেন—প্রতিবাদী নন। বলা যায় বাস্তববাদের সার্থক প্রবক্তা তিনি কিন্তু বস্তুবাদী উপন্যাস সাহিত্যের জনক নন।

গ্রাম তারাশঙ্করের স্ব-ক্ষেত্র। শরৎচন্দ্রের মতই তাঁরাশঙ্করও সামন্ততান্ত্রিক সমাজকে তাঁর উপন্যাসের বিষয় করেছেন। যদিও তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি হয়ে উঠেছে সহুরে মানুষ। আভিজাত্যের প্রতি তারাশঙ্করের মোহ দুর্নিবার। কালিন্দীর চর দিতে পারত কিছু দামাল চরিত্র, গণদেবতায় ময়ূরাক্ষীর প্লাবনের মতই পুরাতনকে ভাসিয়ে দিতে পারতেন কিন্তু তা করেননি। সম্ভবত দেবু ঘোষের মানসিকতাই তাঁর নায়কদের, প্রধান চরিত্রগুলির শেষ কথা। দেবু ঘোষ ভাবে,—"এ-গ্রামে তাহার সমকক্ষ বিদ্বান ব্যক্তি কাহাকেও তো সে দেখিতে পায় না।" অহীন সহুরে তাত্ত্বিক নেতার মতই কালিন্দীর চরে হাঁটা চলা করে।

হাঁসুলি বাঁকের উপকথা, কালিন্দী, গণদেবতা কিংবা ধাত্রী-দেবতায় সংঘাতটা ঠিক ধরা দিয়েছিল তারাশঙ্করের দৃষ্টিতে। কাহার পাড়ার সঙ্গে রেলপথ বসানোর জন্য জমির মালিকানার দ্বন্দ্ব কিংবা অস্তগামী সামন্তপ্রথায় সুবিধা ভোগীর সঙ্গে স্থানীয় শোষিত সাঁওতালদের বিরোধ ঐতিহাসিক। পরিণতি ঐতিহাসিক নয়।

কালবৈশাখী এলোনা চৈতালী ঘূর্ণির পর। তারাশঙ্কর আনলেনই না। তিনি গ্রামের কথাই বললেন অন্যভাবে। শোষণের চিত্র আঁকলেন। দুই প্রজন্মের দ্বন্দ্বও দেখালেন। শিল্প গ্রাস করছে কৃষিকে সে কথাও বললেন। বললেন, বিজ্ঞানের কাছে বিশ্বাসের পরাজয়ের কথাও। তাঁর থীমের মধ্যে যুগপৎ স্থায়ী ও তাৎক্ষনিক বিন্যাস এলো—স্ব-বিরোধী একটা বাতাবরণ প্রবহমানতা রুদ্ধ করে দিল।

ছাঁচের একদিকে আছে জমিদার—রায়বাড়িতে রাবণেশ্বর, জলসাঘরে বিশ্বম্ভর, ধাত্রীদেবতায় শিবনাথ এবং কালিন্দীতে ইন্দ্র রায়। আশ্চর্য, এদের পরাজয়ও সহানুভূতি উদ্রেক করে। তারাশঙ্করের মমতা এবং স্নেহচ্ছায়া থেকে এরা কখনো বঞ্চিত হয় না। ঐতিহ্যের প্রতি ওঁর মোহ যাবার নয়। পঞ্চগ্রামের প্রবীণ ন্যায়রত্ন দেশত্যাগী হলেন। ন্যায়রত্ন, নব-প্রজন্মের সঙ্গে সংগ্রামে পরাজিত, বিধ্বস্ত—পৌত্র উপবীত বর্জন করে কমিউনিস্ট হবে বলে। স্মরণীয়, ব্রাহ্মদের উপবীত ত্যাগের প্রশ্নে সেকালের তীব্র বিতর্ক। পাঠকের মনে স্থায়ী হয় করুণ রস—ন্যায়রত্নের বেদনা।

কালিন্দীর অহীন সাম্যবাদে দীক্ষা নিচ্ছে। বিবর্তন যেন তাত্ত্বিক। হতে হয় তাই হয় আর কি। সেই কথা—"ডাকিতেও মন চায় না। আবার না ডাকিলেও মন খুঁত খুঁত করে।" যেন ভারসাম্য রক্ষার জন্যই আরতি গান্ধীবাদী হয়। যুগটাই তো, অন্তত ভারতের ক্ষেত্রে, গান্ধী-মার্কসে বিভক্ত। পৌষলক্ষ্মীতে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় মুকুন্দ। বুর্জোয়া শিল্পপতি বিমল মুখুজ্যের কাছে বিধ্বস্ত জমিদার রামেশ্বর। জলসাঘরে মহিম গাঙ্গুলীর কাছে পরাজয় মেনে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় জমিদার বিশ্বম্ভর

হেডমাস্টার গল্পেও প্রবীণ চন্দ্রভূষণ স্কুল থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সংগ্রামে বিজয়ী নবীন যুবক শীতেশ বাবু। বিরোধের বিষয় ছিল স্কুলে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হবে কিনা। শীতেশ বাবু ধর্ম শিক্ষার বিরোধী এবং বিজয়ী।

এ-সব সত্ত্বেও তারাশঙ্কর কেন স্মরণীয় তারিণী মাঝি কিংবা তিন-শূন্য গল্পের জন্য? কেন বলা হয় তিনি আদিম জৈবিক সত্তার সার্থক রূপকার? সচেতন রাজনৈতিক কর্মী তারাশঙ্কর ১৯৩৫-এ কেন লেখেন রাইকমল! ইতালীর মুসোলিনী ঐ বছরই আবিসিনিয়া আক্রমণ করেন। ১৯৩৯-এ মাণিক লেখেন সরীসৃপ আর তারাশঙ্কর লেখেন ধাত্রীদেবতা। ১৯৪৪-এ তারাশঙ্কর সঠিক যুগচেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন মন্বন্তর লিখে। ঐ বছরই বিজন ভট্টাচার্য প্রকাশ করেন নবান্ন নাটক। ভুললে চলবে না, সমালোচকের মতে মন্বন্তর উপন্যাস নয় সাংবাদিকতা। যদিও কবি উপন্যাস লিখে তারাশঙ্কর প্রমাণ করেছেন চরিত্র সৃজনে, সংঘাত সৃষ্টিতে তিনিও দক্ষ।

তারাশঙ্করের রাজনৈতিক অবস্থান ঠিক কোথায় ছিল? লেনিন সম্বন্ধে তাঁর মতামত আমরা উল্লেখ করেছি। এবার গান্ধী প্রসঙ্গে তাঁর মনোভাব দেখা যাক।

গান্ধী প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর বলেন,—"একদা মহাত্মাজীর জীবন ও বাণী মানব ভবিষ্যতের কুয়াশাচ্ছন্ন অনিশ্চয়তা ছিন্ন করে একটি স্থির আলোকজ্জল পথরেখা যেন মনের চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত করে তুলেছিল। এবং সারা জীবনই আমি আমার জীবনের আচরণের মধ্যে সেই পথ ধরেই চলতে চেয়েছি।"

১৯৫৭ সালে তাসখন্দে অনুষ্ঠিত এশিয় লেখক সম্মেলনে তিনি ছিলেন ভারতীয় দলের নেতা। যদিও ১৯৫১ সালে আমন্ত্রণ পেয়েও রুশ দেশ সফরে যাননি তারাশঙ্কর! রবীন্দ্রনাথকেও দুবার রুশ সফরের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছিল। তার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে রবীন্দ্র প্রসঙ্গে। তারাশঙ্কর ১৯৫১ সালে রুশ দেশ না যেতে পারার জন্য কোন কারণের উল্লেখ করেননি। তারাশঙ্কর ১৯৫২ থেকে

১৯৫৮ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে বিধান পরিষদে রাজ্যপাল মনোনীত সদস্য ছিলেন এবং ১৯৫৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ছিলেন রাষ্ট্রপতি মনোনীত রাজ্যসভার সদস্য। ১৯৫২ ও ১৯৫৮তে যথাক্রমে পদ্মশ্রী ও পদ্মভূষণ খেতাব পান। শরৎচন্দ্র এবং তারাশঙ্কর দুজনেই কংগ্রেস রাজনীতির কাছের লোক ছিলেন। যেটা পরমাশ্চর্য তা হলো তারাশঙ্কর লেনিন এবং বামপন্থী গণসংগঠনগুলি সম্বন্ধে শ্রদ্ধা পোষণ করতেন এবং তার কাজে অংশ গ্রহণও করতেন। গান্ধী ও লেনিনকে একই সঙ্গে শ্রদ্ধা করা সম্ভব। কিন্তু তারাশঙ্করের মত সচেতন ঔপন্যাসিকের পক্ষে এই নেতাদ্বয়ের দ্বারা একই সময় প্রভাবিত হওয়া যেন কেমনতর।

১৯২১ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ জাতীয় জীবনে গান্ধীজীর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত, "একমাত্র লেনিনই ছিলেন আমার জীবনের নায়ক" বলে উল্লেখ করেছেন তারাশঙ্কর। ১৯২১-এর এক মধুর সকালে তারাশঙ্করের জীবনে নেতা ও আদর্শের পরিবর্তন হলো এটা মেনে নিতে একটু খট্‌কা লাগছে। তা যদি হতো তাহলে ১৯৫২-এ কেন তিনি বলবেন,— "এই আশ্চর্য মানববন্ধুটি [লেনিন] আজও আমার পথ প্রদর্শক।"

ভাববাদ এবং বস্তুবাদের প্রতি সমান আকর্ষণ তারাশঙ্করের জীবনের এক দুঃসহ মানসিক সংকট। এটা তিনি কোনদিন কাটিয়ে উঠতে পারেননি। আরোগ্য নিকেতনের জীবন মশায় এই দোলাচল মানসিকতার প্রতিনিধি। আরোগ্য নিকেতন আরও বোল্ড হতে পারত। মৃত্যুর মাধ্যমে মিলন এতে আকস্মিক ম্যাচিউরিটি এনেছে। এখানে তারাশঙ্কর সংগ্রাম আনতে চেষ্টা করেও পারেননি। বস্তুত যে যুদ্ধটা ছিলনা তার কী বর্ণনা দেওয়া যায়?

মনে হয় ভাববাদ ও বস্তুবাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের মীমাংসা তাঁর জীবনে হয়নি। তারাশঙ্কর হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন গান্ধীকে কিন্তু বুদ্ধি বা মনন চেয়েছিলো লেনিনকে! ভাববাদী তারাশঙ্কর একমোহময় দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন ফেলে আসা গ্রামজীবন, তার মূল্যবোধ এবং ভঙ্গুর সামন্তব্যবস্থাকে। বেদনায় তা সিক্ত। যন্ত্রযুগ, নব-চিন্তা এবং বিজ্ঞানকে স্বাগত জানিয়েছেন যুক্তিবাদী এবং লেনিনপন্থী তারাশঙ্কর

বস্তুবাদী মূল্যবোধ, তারাশঙ্করের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে অনেকটা পথ হেঁটেছে। কিন্তু পরিণতি পায়নি। সহৃদয়তা না পেয়ে কাহিনী এবং চরিত্র সাংবাদিকতার অভিযোগে অভিযুক্ত। একারণেই তারাশঙ্করকে বলতে হয়,—"না দিব চরণে হাত না খাব উচ্ছিষ্ট ভাত", সামন্তবাদী মানসিকতা সৃজন প্রয়াসে। শিবনাথ কিশোর হলেও চরণে হাত দেবে না। কারণ সে জমিদার এবং উচ্চবর্ণের মানুষ। চতুরঙ্গে বিপরীত দৃষ্টি কোণ থেকে রবীন্দ্রনাথ বলেন,—"ইহাদের মধ্যে প্রণাম করিবার প্রথা ছিলনা।" লক্ষণীয় যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ইহাদের মধ্যে ছোট বড় কেউই প্রণাম করে না। বিশাল অভিজ্ঞতা এবং প্রতিভা সত্ত্বেও তারাশঙ্কর বুদ্ধি ও হৃদয়ের দ্বন্দ্বে দোদুল। ক্ষতবিক্ষত। তবুও তিনিই বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে সাব্‌জেক্‌টিভ্‌ রিয়ালিজমকে প্রায় অবজেকটিভ রিয়ালিজমে পৌঁছে দিয়েছিলেন। দ্বিধা কাটাতে পারলে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার জনকও তিনি হতে পারতেন।

যতীন্দ্রনাথ : প্রতিবাদে মুখর

নব কাব্যরুচি আর বুদ্ধিবাদ যা' দিয়ে গেলেন সত্যেন্দ্রনাথ, তার চমৎকার সার্থকতা দেখা যায় কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মধ্যে (১৮৮৭—১৯৫৪)। যতীন্দ্রনাথ ছিলেন মেধাবী ছাত্র। জন্মেছিলেন অতি সাধারণ পরিবারে। মেধার জোরেই শিবপুর বি. ই কলেজ থেকে ইঞ্জিনীয়ার হন। কর্মজীবনে তিনি প্রথমে উপদর্শক [ওভার্‌-সীয়ার্‌] ও পরে বাস্তুকারের [ইঞ্জিনীয়র] কাজ করেন।

কবির প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল্‌ প্রবাসীতে, কবিতাটির নাম শীত। শীত থেকে চলে গেলেন মরুভূমিতে। একে একে প্রকাশিত হলো, মরীচিকা [১৯২৩], মরুশিখা [১৯২৭], ও মরুমায়া [১৯৩০]। প্রথম তিনটি কাব্যের সঙ্গেই 'মরু' শব্দটি যুক্ত। কবি তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন—

"বাংলায় বসে ভালোবেসেছিনু সুদূরের মরুভূমি,
সে ছিলনা মোর ক্ষণিক খেয়াল সেকথা জানিতে তুমি।"

মরুভূমির প্রতি আর এক বিদ্রোহী কবি নজরুলেরও একটা আকর্ষণ ছিল। হয়ত বাংলার প্রকৃতির মধ্যে প্রতিবাদের মিল এরা খুঁজে পাননি বলেই এই মরু মোহ। কবি অন্যত্র বলেছেন—

"চেরাপুঞ্জি থেকে
একখানি মেঘ ধার দিতে পার গোবি সাহারার বুকে।"

এখানেও সেই প্রতিবাদ। গোবি সাহারার চরিত্র পাল্টে দিতে হবে। যতীন্দ্রনাথকে বাংলা সাহিত্যে দুঃখবাদী কবি বলে উল্লেখ করা হয়। শব্দটি সুপ্রযুক্ত নয়। প্রতিবাদী বক্তব্যকে দুঃখবাদী বলা শব্দব্যবহারে বিলাসের নামান্তর। হয়ত তিনি অসচ্ছল ঘরের সন্তান ছিলেন বলে এবং ১৯২০ সালে তার চার বছর বয়সের শিশু-পুত্রের মৃত্যুর জন্যই কবি প্রসঙ্গে এই অনুষঙ্গ বিভ্রাট।

যতীন্দ্রনাথ অভিজ্ঞতার দ্বারাই জেনেছিলেন প্রতিবাদের প্রয়োজন আছে। এই প্রতিবাদ হবে শব্দ ব্যবহারে, বাক্যগঠনে, বিষয়ে এবং

বক্তব্যে। নজরুল অবলীলায় বিদেশী শব্দ ব্যবহার করেছেন তাঁর কবিতায়। সেক্যুলার নয় এমন শব্দও ব্যবহার করেছেন ধর্মনিরপেক্ষ দ্যোতনায়। যতীন্দ্রনাথ শব্দ ব্যবহারে সাধারণ মানুষের, গ্রামের মানুষের মুখের কথা টেনে এনে ঠেসে বসিয়ে দিয়েছেন কাব্য-চরণে। তাতে কাব্য লক্ষ্মীর চরণ-চাঞ্চল্য বিন্দুমাত্র ব্যাহত হয়নি। তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'ফেমিন রিলিফ'-এর কয়েকটি চরণ—

'ঘরে বসে মড়কে
চলেছিলি নরকে,
না হয় কোদাল হাতে' মরবি এ সড়কে।
খাট্ তবে খাট্ রে
ডোঙা পেট কোঙা করে গোঙা মাটি কাট্ রে।'

কবির বাক্যগঠনে এনেছেন আকস্মিকতা। এর ফলে বক্তব্য সতেজ ও সার্থক হয়েছে—

"বৌবাজারের মোড়ে
যেখানে ফুলের দোকানের পাশে কসাই মাংস থোড়ে।"

যতীন্দ্রনাথের কাছে যে-কোন বিষয়ই কবিতার বিষয় হতে পারে। মরুশিখা কাব্যগ্রন্থের লোহার ব্যথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই কবিতায় তিনি বক্তব্যে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। লোহা পুড়িয়ে পিটিয়ে কর্মকার উদ্দিষ্ট জিনিসটি বানায়। কবি এর মধ্যে চিরায়ত শোষক এবং শোষিতের চিত্র দেখতে পেয়েছেন। লোহা মার খেয়ে বলছে,—

"আগুনের তাপে সাঁড়াশির চাপে আমি
চির নিরুপায়,
তবু সগর্বে ভুলিনি ফিরাতে
প্রতি হাতুড়ির ঘায়।"

নবান্ন কিংবা লোহার ব্যথা আমাদের সুকান্তর কথা মনে করিয়ে দেয়। শুধু তো প্রতিবাদ নয়,—বিষয়, শব্দ, বাক্ বিন্যাসেও তিনি অভিনব। যদি নতুন সমাজ গঠনের প্রতিশ্রুতি দিতে পারতেন কবি

যতীন্দ্রনাথ তবে বাংলা সাহিত্য আরো চল্লিশ বছর আগেই সুকান্তকে পেত।

যতীন্দ্রনাথ ১৯৪১-এ লেখেন সায়ম্। এরপর প্রকাশিত হয় ত্রিযামা ও নিশান্তিকা যথাক্রমে ১৯৪৪ ও ১৯৫৭-এ। কবি তখন আর আমাদের মধ্যে নেই। বাংলা সাহিত্যে বস্তুবাদের প্রাক্ পর্যায়, যাকে আমরা প্রতিবাদী পর্যায় বলতে পারি, তার প্রথম কবি যতীন্দ্রনাথ।

মোহিতলাল : যৌবনে দাও জয়টিকা

'সত্য শুধু কামনাই—মিথ্যা চির-মরণ-পিপাসা !
দেহহীন, স্নেহহীন, অশ্রুহীন বৈকুণ্ঠ স্বপন !
যমদ্বারে বৈতরণী, সেথা নাই অমৃতের আশা—
ফিরে ফিরে আসি তাই ধরা করে নিত্য নিমন্ত্রণ !'

বাংলা কাব্য সাহিত্যে 'বীরাচারী' ও 'দেহবাদী' কবি বলে পরিচিত মোহিতলাল মজুমদার [১৮৮৮-১৯৫২] রবীন্দ্র সমকালে একটি স্বতন্ত্র ধারা প্রবর্তন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন অসীমের নামে চিত্ত মুক্তি খুঁজছিলেন, মোহিতলাল তখনই মানুষ এবং তার দেহের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দেহ কিংবা মানুষ কেবলম্ বললে বস্তুবাদ হয় না। মোহিতলালের কাছে ঋণী যে ধনে আমরা, তা হলো, তিনি বিশ্বাস করতেন—"যৌবনে দাও জয়টিকা।" প্রেমের রাজ্যে কপটতা তিনি বন্ধ করেন। দেহহীন প্রেম যুবকের জন্য নয় কিন্তু দেহ মানেই প্রেম নয়, এটা তিনি জোরের সঙ্গে বলেছেন।

যৌবন ও মানুষের প্রতি এই টানের জন্য তাঁকে একটা টান টান ভাষাও সৃষ্টি করতে হয়েছিল। এতে করে কাব্যে কল্পনার পরিবর্তে বাস্তবতা প্রকাশের পথ সুগম হয়। চিন্তার ক্ষেত্রেও তিনি নতুন ধারা আনলেন। সম্ভবতঃ বৈষ্ণব দর্শন প্রভাবিত ভাববাদী চিন্তা তাঁর কাছে তেমন গুরুত্ব পায়নি। শাক্ত ক্রিয়াকর্মে প্রভাবিত অন্য একটি ধারার প্রতি তাঁর কিছুটা আগ্রহ দেখা যায়। এর ফলেই হয়তো তাঁর দেহবাদী পরিচয়। বস্তুবাদী দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত না হয়েও মোহিতলাল বাংলা কবিতায় একটা নতুন ঢঙ এনেছিলেন। বৈষ্ণবীয় ধারা তা নয়। আবার শাক্ত জীবন দর্শনও তাকে বলা যাবে না। সম্ভবতঃ একালের পাশ্চাত্য শিক্ষা ও রুচির প্রভাবে কবির 'দেহবাদী' মনোভাবটি গঠিত হয়েছিল। মোহিতলালের তীব্র ভোগেচ্ছাও দ্বন্দ্বমুক্ত নয়। দ্বন্দ্বহীন প্রেমেই ধর্মের ওজুহাত অপরিহার্য হয়ে উঠে। এই দ্বিধা প্রসঙ্গেই হয়তো কবি বলতে চেয়েছেন,—

'তবু মনে হয়
এ সুন্দর স্বর্গখানি প্রেতের আলয়।
কামনা-অঙ্কুশ-ঘাতে যেই পুনঃ হইনু বিকল,
অমনি বাহুতে কারা পরায় শিকল।
তীব্র সুখশিহরণে ফুকারিয়া উঠি যবে মৃদু আর্তনাদে—
নীরব নিশীথে কারা হাহারবে উচ্চকণ্ঠে কাঁদে।'

যৌবনকে এই যে তার স্বধর্মে গ্রহণ—তার ফলে যুবশক্তি আপন যৌবনের গৌরবেই কাব্যে স্বীকৃতি পেল। যুবক এলে তার মুখের ভাষাও আসবে। মোহিতলাল সেটা পারেননি। পেরেছিলেন নজরুল। কিন্তু নজরুল প্রসঙ্গের আগেই আর একটি প্রবল ধারার কথা বলতেই হবে। সেটি বাংলা কাব্যে এনেছিলেন কবি জীবনানন্দ দাশ।

জীবনানন্দ দাশ : অবশেষে ফিরে এলেন বাস্তবে

বিংশশতাব্দীর দুজন শ্রেষ্ঠ কবির জন্ম উনবিংশশতাব্দীর একেবারে শেষ প্রান্তে। এই কবিযুগল জীবনানন্দ দাশ [১৮৯৯—১৯৫৪] এবং কাজী নজরুল ইসলাম [১৮৯৯—১৯৫২]। জীবনানন্দকে দীর্ঘজীবী বলা যাবে না। কবির মৃত্যুর কারণ মর্মান্তিক! পথ দুর্ঘটনায়! ট্রামে কাটা পড়ে। ট্রামে কাটা পড়া খুবই বিরল ঘটনা। নজরুল কিন্তু স্বল্পায়ু ছিলেন না। যদিও ১৯৪২-এর পর থেকে আমৃত্যু কবি ছিলেন স্মৃতিভ্রষ্ট, রুদ্ধবাক্। বহিরঙ্গের এই আপাত মিল এঁদের কাব্যে বিন্দুমাত্র প্রতিফলিত হয়নি।

কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালখ'। প্রকাশিত হয় ১৯২৭ এ। প্রায় ন'বছর বিরতি—দ্বিতীয় কাব্য 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'। জীবনানন্দ ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। সঙ্গত এই প্রত্যাশা—তিনি ইংরেজী সাহিত্যের খোঁজ খবর রাখবেন। ১৯৩০-এ প্রকাশিত হয়েছিল স্টিফেন স্পেণ্ডারের টুয়েন্টি পোয়েমস্ [Twenty Poems] ধূসর পাণ্ডুলিপি প্রকাশের পূর্বে। স্পেণ্ডার কিংবা ঐ সময়ের বামপন্থী আন্দোলনের কোন প্রভাব জীবনানন্দের কাব্যে আমরা পাইনা।

বাঙলা তথা ভারতেও তখন রাজনৈতিক কর্ম-তৎপরতা প্রবল আকার ধারণ করেছে। প্রীতিলতা ওয়াদেদার শহীদ হন ১৯৩২ সালে। সমাজতন্ত্রী বলে পরিচিত জওহরলাল নেহরু [১৮৮৯-১৯৫২] কংগ্রেস দলের সভাপতি নির্বাচিত হন ১৯৩৬-এ। আইন সভার নির্বাচনে বাঙলা ও পাঞ্জাব বাদে অন্যসকল হিন্দু প্রধান রাজ্যে কংগ্রেস দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। বাঙলায় মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে চলে প্রচণ্ড তৎপরতা। ঐ বছরেই মুন্সী প্রেমচন্দের প্রবন্ধ পুস্তক 'মহাজনী সভ্যতা' প্রকাশিত হয়। মাণিক লেখেন 'প্রাগৈতিহাসিক'। কবি ১৯৪২-এ লেখেন 'বনলতা সেন'। তখন মনে হয়েছিল কবি সম্ভবত, কোন দূর জগতের অধিবাসী। সে জগৎ কবির বর্ণনায়, ধূসর, মায়াবী এবং দূর অতীতকালের।

'সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে ; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে-ফেলে চিল ;
পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল ;
সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—
ফুরায় এ-জীবনের সব লেন দেন ;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।'

ভাবতে ইচ্ছে করে দেশের এই অস্থিরতার কিছুই কী কবির 'পাখির নীড়ে' দোলা দেয় নি? জীবনের সব লেন দেন ফুরিয়ে গেল? কোন সচেতন মানুষের ক্ষেত্রেই এটা ঘটে না। কবির ক্ষেত্রেও অন্যথা হয়নি।

তিনি ফিরে তাকালেন বৃহত্তর সমাজের দিকে। বিবর্ণ বিধ্বস্ত পৃথিবীর দিকে। বাঁচার জন্য সংগ্রামে উদ্যত শোষিত মানুষের দিকে। 'তিমির হননের গান' তিনিই লিখেছেন। এই সময়ের কবিতায়, যুদ্ধক্লান্ত পৃথিবীর কথা, তাদের বাঁচার প্রশ্ন এবং সাধারণ মানুষ এসেছে তাঁর কাব্যে। তিনি কিছুটা বা ক্রুদ্ধও। সেইসব মানুষ, যাদের বলা হয় সুবিধাবাদী আর স্ববিরোধী, তিনি তাদের প্রতি বিদ্রূপের বাণ নিক্ষেপ করলেন। 'অদ্ভুত আঁধার এক' কবিতায় লিখলেন,—

'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা ;
যাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই—প্রীতি নেই—
করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।'

এদের, এই করুণাহীনদের স্মরণে রেখেই হয়তো রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,—'নাগিনী' এবং এরা পৃথিবী বিদ্ধ করে 'বিষাক্ত নিশ্বাসে'। 'নির্জনতার কবি' বলে জীবনানন্দকে আর উল্লেখ করা একপেশে হবে। হয়তো অতীতচারী তিনি ছিলেন। কিন্তু বর্তমানকে উপেক্ষা

করেন নি। 'সাতটি তারার তিমিরে' কবি প্রতিবাদী এবং দুঃসহ ক্রোধের প্রকাশ ঘটেছে 'এই সব দিনরাত্রি' কবিতায়। তিনি বর্ত্তমান সমাজ চিত্রও যথাযথ তুলে ধরতে পেরেছেন।

"কিন্তু সেই শুভ রাষ্ট্র ঢের দূর আজ।
চারিদিকে বিকলাঙ্গ অন্ধভিড়—অলীক প্রয়াণ।
মন্বন্তর শেষ হলে পুনরায় নব মন্বন্তর ;
যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দী রোল ;
মানুষের লালসার শেষ নেই

* * * *

অপরের মুখ ম্লান করে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ নেই।"

প্রতিবাদের কবিতা লেখা সত্ত্বেও জীবনানন্দ প্রতিবাদী কবি নন। তিনি ভাববাদী কবি। তবুও, তাঁকে যে এরকম প্রতিবাদের কবিতা লিখতে হয় তার কারণ, সমাজটা এমন এক পর্যায় নেমে এসেছিল যখন জীবনানন্দকেও প্রতিবাদ করতে হয়। জীবনানন্দের প্রতিবাদ ঐতিহাসিক। ঐতিহাসিক কারণেই তা বিস্মৃত হলে সত্য থেকে বিচ্যুত হতে হবে। আবার এও বলতে হবে, যতীন্দ্রনাথ বস্তুবাদের যে প্রবাহ সৃষ্টি করেছিলেন, জীবনানন্দ তা কিছুটা শ্লথ করে দিলেন।

কাজী নজরুল ইসলাম : কাব্য ঐতিহ্য মুক্ত

কালের পরিমাপে কবিতা ধর্মের মতই প্রাচীন। ধর্মের ভাষা ছিল কবিতা কিংবা কবিতা-প্রতিম। যখনই ধর্মের ভাষার স্থান নিয়েছে গদ্য, তখনই ধর্ম ব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেছে। বৌদ্ধ ধর্ম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। দীর্ঘ ব্যবহারে কবিতার শব্দ তাই ধর্ম-মন্ত্রের মত হয়েছে সংহত, ঋজু আর সিদ্ধ। কোন কোন শব্দের সঙ্গে আছে দীর্ঘ ব্যবহারের অনুষঙ্গ। যা ব্যাপ্ত হয়েছে বাচ্যার্থে, কখনো স্পষ্ট হয়েছে যোগরূঢ় বলে স্বীকৃতি পেয়ে। এইসব শব্দের ভিন্নার্থে ব্যবহার তো সিদ্ধরস ভঙ্গের মতই অমার্জনীয় অপরাধ। কবিতায় শব্দের সঙ্গে অক্ষরও পেয়েছে একটা ব্যঞ্জনা। ভাববাদীরা কবিতার ক্ষেত্রে তাই যুগপৎ পেয়েছে সুচিহ্নিত পথরেখা কিন্তু ওজনদার পিছুটান। এই টান, যাকে কিনা কেউ কেউ বলেন ঐতিহ্য, তা সম্মোহিত করে রাখে কবিকে। কবিতা-রাজ্যে ভাববাদী মাত্রেই তাই রক্ষণশীল। তার রক্ষণশীলতা আড়াল করতে সে কতইনা তত্ত্ব এনেছে সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদী পাঠকের জন্য।

কবিতায় ব্যবহৃত উপমা, রূপক এবং ব্যঞ্জনা—সব কিছুর মধ্যেই আত্মগোপন করে আছে ভাববাদী তথা ধর্মীয় সম্মোহন। কবিতা রচনার ক্ষেত্রে বস্তুবাদী ঐতিহ্যহীন। তাকে হতে হয় নিঃসঙ্গ পথিক। বস্তুবাদীর কাম্য শব্দটিকে কাব্য গ্রাহ্য করতে প্রতিনিয়ত সতর্ক থাকতে হয়। অনভ্যস্ত শব্দ ঝংকার পাঠক গ্রহণ করতে পারে না। বলা হয়, বস্তুবাদী কবিতা প্রচার, প্রবন্ধ কিংবা তত্ত্ব প্রচারের ছন্দোবদ্ধ রূপ। অভিযোগকারীকে সর্বক্ষেত্রে অসৎ বলা যাবে না। অনভ্যস্ত পাঠক রসাস্বাদনে অক্ষম হতেই পারে। মেঘনাদবধ কাব্যের ক্ষেত্রেও এটা ঘটেছিল। দুটি বিদ্যুৎ প্রবাহকে সমলয়ে আনতে দক্ষ তড়িৎবিদকে অপেক্ষা করতে হয়। খাঁটি বস্তুবাদী কবিকেও অপেক্ষা করতে হবে ভাববাদী ঐতিহ্য ভেঙ্গে বস্তুবাদী কবিতা-গ্রহণ-কালের জন্য। কবিতার রাজ্যে ভাববাদীরা এই ঐতিহ্যের কারণেই এখনও প্রাধান্য পাচ্ছে। ধর্মীয় বাতাবরণের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগে এটা হচ্ছে।

প্রাচীন ইমারতের মতই খসে পড়ছে তার পলস্তরা, ভেঙ্গে যাচ্ছে ঐতিহ্যের প্রাসাদ। নতুন নতুন শব্দকে ব্যবহারের আকস্মিকতায় মানব যন্ত্রণাকে যে-ভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে প্রতিবাদী কবিতায়, তাতে করে এই কবিতাকে আর অগ্রাহ্য করা যাচ্ছে না। নব-অনুষঙ্গ বহু ব্যবহারে, নব-উপমা অর্থপূর্ণ হওয়ায় এবং রূপকের নব-নির্মিতি পাঠক গ্রাহ্য-হচ্ছে। প্রাচীন অনুষঙ্গযুক্ত এবং ঐতিহ্যবাহী শব্দ দিয়ে প্রতিবাদী তথা বস্তুবাদী কবিতা লেখা যাবে না। নতুন নতুন শব্দের দাপটে নির্মিত হচ্ছে এ-কালের কবিতা।

এই কাজটা, কবিতায় প্রতিবাদী স্পর্ধা আনা, বাংলা কাব্যে নজরুলের প্রধান অবদান। যদিও নজরুল প্রতিবাদের কবি, বিদ্রোহের কবি কিন্তু বিপ্লবের কবি নন। জীবনানন্দের প্রভাব থেকে বাংলা কবিতাকে মুক্ত করে নতুন পথের সন্ধান দেন নজরুল।

সাম্যবাদ নজরুলকে টেনেছে। কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ [১৮৪৯—১৯৭৩—ভারতের কমিউনিস্ট দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা] ছিলেন নজরুলের বন্ধু, পথনির্দেশক আর দর্শনের উৎস। শোষিত মানুষেরই একজন ছিলেন নজরুল। জীবিকার-প্রয়োজনে সৈন্য-বাহিনীতে যোগ দেন। এই সূত্রেই হিন্দুস্থানের নানা প্রান্ত ঘুরে ফিরে দেখার সুযোগ পেয়েছেন তিনি। ১৯০০ থেকে ১৯২১ ভারতীয় ইতিহাসের এই তরঙ্গ সঙ্কুল অধ্যায়ের তিনি দর্শক এবং অভিনেতা। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি বুঝেছিলেন, চাই বিদ্রোহ। কবির একুশ বছর বয়সে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ “ব্যথার দান”। এই গ্রন্থ-ই কবির বিদ্রোহী মনের পরিচয় বহন করে। ব্যথার দান গল্পের দুটি চরিত্র, দারা এবং সইফুল মূলক বালুচ। উভয়েই আফগান সীমান্ত অতিক্রম করে রুশদেশে যায়। সেখানে তারা যোগ দেয় লালফৌজে। ওরা প্রতি-বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সেখানে যুদ্ধ করে।

সাম্যবাদী চিন্তা, রুশ-বিপ্লবের প্রতি সমর্থন এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মানসিকতা নিয়ে বাংলা সাহিত্যের ধূমকেতু, নজরুলের সাহিত্য জগতে আত্মপ্রকাশ। নজরুলের আগে কোন কবিই এতটা

সাম্যবাদ প্রভাবিত ছিলেন না। তিনি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেছেন,—

"আমি সাম্যের গান গাই।" "ব্যথার দান" নজরুলের প্রথম ও শেষ গল্পগ্রন্থ।

১৯২২-এ প্রকাশিত হলো নজরুলের প্রথম কাব্য গ্রন্থ অগ্নিবীণা। এ-গ্রন্থ প্রকাশের আগে থেকেই নজরুল বিজলী পত্রিকা দপ্তরে যাতায়াত করতেন এবং সেখানেই পরিচিত হন বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সঙ্গে। এই বারীন্দ্রকুমার ঘোষকেই কবি 'ভাঙা বাঙলার রাঙাযুগের সাগ্নিক বীর' বলে অভিনন্দিত করেন। 'অগ্নিবীণা' গ্রন্থ তাঁকেই উৎসর্গ করেন। ১৯২১-এ প্রতিষ্ঠিত হয় চীনের কমিউনিস্ট দল। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে ১৯১৯-এ। প্রতিবাদী রাজনীতি, ১৯০৮-এ ক্ষুদিরামের ফাঁসি থেকে প্রবল আকার নেয়। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা যা কার্যকর হয়েছিল ১৯২৩-এ তার প্রস্তুতি চলছিল অনেক আগে থেকেই। এ-সবের উত্তর এবং প্রতিকারের পথ পেলেন নজরুল সাম্যবাদে। যদিও নজরুলের 'সাম্যবাদ' ঠিক কমিউনিজম নয়।

কবিতায় নজরুল আনলেন প্রতিবাদ—শোষণ এবং প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। এই প্রতিবাদী কাব্যের প্রয়োজনে কবি কাব্যে ব্যবহার করলেন নতুন বাগ্‌বিন্যাস, শব্দ, শব্দানুষঙ্গ, উপমা এবং ছন্দ। নারী-পুরুষের সমানাধিকারের প্রশ্নে তিনি সমানাধিকারের সপক্ষে অন্যতম প্রথম কবি। কবির ভাষায়—

'আমার চোখে নারী ও পুরুষে কোন ভেদাভেদ নাই।' নজরুলের প্রতিবাদী কণ্ঠ, তাঁর বাচনভঙ্গী এবং বাক্য বিন্যাস যুব-জনতাকে মাতিয়ে দিল। কবি বললেন,—

"যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীমরণভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত।"

বিদ্রোহ শব্দটা নয়, তার প্রবল ভাবাবেগটাই বাংলা সাহিত্যে নতুন। বাক্যে আরবী-ফার্সী-উর্দু শব্দের সাবলীল প্রয়োগ কবির বক্তব্যকে তেজোদৃপ্ত করেছিল। যেটা প্রচলিত শব্দ কিংবা শব্দানুষঙ্গে একেবারেই অসম্ভব ছিল। তিনি যৌবনের অকারণ পুলক আনলেন কাব্যে। নতুন বাংলা কাব্যে নজরুল যুব-জাগরণের অগ্রদূত। আন্তর্জাতিক সংগীতের বঙ্গানুবাদ তাঁর সাম্যবাদ প্রীতির অন্যতম নিদর্শন। কবিতা লেখার জন্য নজরুলকে কারাবরণ করতে হয়েছিল। বাংলা সৃজনী সাহিত্যে, লেখার জন্য কারাবরণের ঘটনা সেই প্রথম। তাঁর প্রতিবাদী ভাষার শক্তির প্রভাব এর থেকেই অনুমেয়। রাজ্যের প্রাদেশিক সম্মেলনে, দেশবন্ধুর বাংলা চুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন নজরুল সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ এনে! কর্মে এবং কাব্যে তিনি অভিন্ন আদর্শের পরিচয় দিয়েছিলেন।

তারাশঙ্করের মতই নজরুলও সন্তানের [পুত্র] মৃত্যুশোকে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠলেন। হয়তো এ-কারণে বা যে কোন কারণেই হোক, তাঁর কাব্য এবং মানসে এর পর পালাবদল শুরু হয়। খাঁটি বস্তুবাদী দর্শন প্রভাবিত কবিতার জন্য ঐতিহ্যের সঙ্গে যে একটা সংঘাত দরকার ছিল, নজরুল খুব জোরের সঙ্গে সে-কাজটা করেছেন। নজরুল বাংলা কাব্য-সাহিত্যে বস্তুবাদী চিন্তা প্রবাহের অন্যতম অগ্রপথিক। এর পরই আমরা বস্তুবাদে বিশ্বাসী একঝাঁক কবি পাব। যারা দায়বদ্ধ। এটা বিশ শতকের চিত্র।

নাটক

মন্মথ রায়ঃ নাটকে প্রতিবাদের শুরু

মন্মথ রায় এবং নজরুল ইসলামের একই বছরে জন্মগ্রহণ কাকতালীয় নাও হতে পারে। নজরুল যে-কাজটি করেছিলেন কবিতায়, সেই কাজটাই মন্মথ রায় করেন নাটকে। বস্তুবাদী বলে মন্মথ রায়কে চিহ্নিত করব না। ভাববাদীও তিনি নন। বস্তুগত বাস্তববাদী মানসিকতা তাঁর মধ্যে দেখা যায়। সে সময় যা ছিল স্বাভাবিক—মন্মথ রায় জাতীয়তামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। নিজেকে জড়িত রেখে-ছিলেন সমাজ সেবামূলক কাজে। উচ্চ-শিক্ষিত এই নাট্যকার শিক্ষা বিস্তারে প্রভূত প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। সাংবাদিকতায়ও তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে আমরা পুরসভা এবং সমবায়ের কাজেও যুক্ত দেখি। সাম্যবাদী দর্শন গ্রহণ করলে তিনি হতে পারতেন প্রথম বস্তুবাদী নাট্যকার!—তা হয় নি।

মন্মথ রায়ের প্রথম নাটক "মুক্তির ডাক" [প্রথম অভিনয় ডিসেম্বর ১৯২৩] অন্যান্যদের সঙ্গে নজরুলের দ্বারাও অভিনন্দিত হয়। পুরাণের কাহিনী এই নাট্যকারকে টেনেছে। "চাঁদ সদাগর" তাঁর অন্যতম নাটক। যুক্তিবাদী মন্মথ রায় পুরাণ কাহিনীকে ধর্মীয় বাতাবরণ থেকে মুক্ত করে, একালের মানবিকবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেন। পুরাণের কাহিনী থেকে ভক্তির প্রাবল্য সেই বিশের দশকেই তিনি বিযুক্ত করতে পেরেছিলেন। মন্মথ রায়ের দেশপ্রেমমূলক নাটক "কারাগার"। উল্লেখ করা হয়েছে, নজরুল ইসলাম কবিতা লিখে কারাবরণ করেছিলেন। মন্মথ রায়ের নাটক, সে-সময়ের শাসক নিষিদ্ধ করেছিলেন। নারী জীবনের সমস্যার কথা তাঁর দুটি নাটকে বলা হয়েছে। নাটক দুটি 'সাবিত্রী' ও 'খনা'। খনা সেই প্রসিদ্ধা মানবী যিনি বরাহ'র গণনায় ভুল ধরেছিলেন। নারী হওয়ার অপরাধে, তাঁর পাণ্ডিত্য তাঁর জীবন যন্ত্রণার কারণ হয়েছিল। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার সব লক্ষণ যুক্ত আদিবাসী সম্প্রদায়—টোটোদের নিয়েও

তিনি নাটক [একাংক] লিখেছেন। স্বাধীন ভারতেও এই নাট্যকার নাট্য-আইন বিরোধী আন্দোলনের সামিল হয়েছেন। প্রতিবাদী এই নাট্যকার বস্তুবাদী নাটকের বার্তাবাহক—ভোরের পাখি। কবিতায় নজরুল এই কাজটাই করেছিলেন। এরই পরিপূর্ণ রূপ গণনাট্য সংঘের নাট্যকর্মে। পরবর্তী সময়ে তা আরো বিবর্তিত হয়েছে। যদিও বাংলা সাহিত্যে নাটক বিভাগটি খুব সবল বলা যাবে না। বিশেষ করে বস্তুবাদী ধারায়। প্রয়োগ কর্মে বরং সফল এবং সফল নাট্য-প্রচার আন্দোলনে। কিন্তু মৌলিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে একথা বলা সঙ্গত হবে না।

নব-নাট্য আন্দোলন বলে যা পরিচিত তার পথিকৃতের সম্মান দেওয়া হয় নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যকে। বিজন ভট্টাচার্যের প্রথম নাটিকা 'জবানবন্দী'। তার যে-নাটক নব-নাট্য আন্দোলনের সূচনা করে, সেই 'নবান্ন' প্রকাশিত হয় ১৯৪৪-এ, এরপর ষোল বছর পর পাওয়া গেল 'গোত্রান্তর' [১৯৬০] কিন্তু এই সময়টা আমাদের আলোচনার মধ্যে রাখা হয় নি। তাই, নব-নাট্য কিংবা প্রগতিমূলক নাট্য রচনায় যারা যুক্ত ছিলেন তাদের নামের উল্লেখ মাত্র করা হচ্ছে।

যারা আছে সবার পিছে, উপেক্ষায়, অবহেলায় এবং শোষণে জর্জরিত তাদের কথাকার তুলসী লাহিড়ী। 'পথিক' এবং 'ছেঁড়া তার' তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক। বস্তুবাদ যাঁর আদর্শ, সেই প্রতিবাদী কণ্ঠ দিগিন্দ্র চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, উদ্বাস্তু জীবনের কথাকার সলিল সেন এবং অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—চল্লিশের দশককে এঁরাই প্রতিবাদ-মুখর করে রেখেছিলেন নাটকে।

বিংশ শতাব্দী

বস্তুবাদী সাহিত্যের জোয়ার এলো

বিংশ শতাব্দীর প্রথম কিংবা দ্বিতীয় দশকে যাঁরা জন্মেছেন তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টির শুরু বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষে কিংবা তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি সময়ে। বস্তুবাদীর কাছে এই সময়টা বিপর্যয়ের, আত্মোপলব্ধির এবং আত্মপ্রসারেরও কাল। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ঘটে গেল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এটা বিপর্যয়ের কারণ। আত্মোপলব্ধির সময়ও এটা কেননা, রাশিয়ার তাসখন্দে এই সময় প্রতিষ্ঠিত হলো ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। আত্মপ্রসার বলা হয় বস্তুবাদী সাহিত্যের প্রবক্তাদের বিভিন্নভাবে তৎপরতা প্রকাশের জন্য।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও এই বিভাজন লক্ষণীয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব থেকে জাপানের সামরিক শক্তি দাপাদাপি করছিল। ১৯০৫-এ তার একটা পরিচয় পাওয়া গেল। আবার পরবর্তীকালে চীন আক্রমণের মাধ্যমে তার চূড়ান্ত আগ্রাসী রূপ প্রকট হলো। ১৯৩৪-এ চীনে মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে লংমার্চ সংগ্রামী শক্তিকে দিল নতুন আত্মবিশ্বাস এবং সংহতি। রাশিয়ার বিপ্লব সাফল্য বস্তুবাদী শিল্প-সাহিত্যের দুনিয়ায় সৃষ্টির জোয়ার আনল।

১৯৩৬-এ ব্রাসেলসে বিশ্বশান্তি সম্মেলন হয়। এতে বাঙলা থেকে প্রগতি লেখক ও শিল্পীদের উদ্যোগে একটি অভিনন্দন বার্তা পাঠান হয়েছিল। এই বার্তায় স্বাক্ষর দাতাদের মধ্যে প্রথম নাম হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। এই প্রসঙ্গ একটু পরেই আসবে। যদিও রবীন্দ্রনাথ এবং তার সঙ্গে অনেকেই এই প্রতিবাদী সম্মেলনের সাফল্য কামনা করেছেন। সত্যের প্রয়োজনে একথাও বলতে হবে ভারতে প্রতিবাদ বিরোধী একটি প্রবল প্রতিপক্ষও ছিলেন। এদের মিলনের প্রচেষ্টা হয়েছে বার বার। ব্যর্থতাও এসেছে প্রতিবার। তার কথাও কিছুটা আসবে এই প্রসঙ্গে।

বিভাজিকা রেখার একদিকে রইলেন ভাববাদী লেখকগণ। এঁদের পরিচয় হল জাতীয়তাবাদী লেখক বলে এবং যারা রাজনীতি করতেন তারা সাধারণভাবে কংগ্রেস অনুগামীই হলেন। মুসলিম লীগ প্রভাবিত একটি তৃতীয় ধারাও দেখা গেল এই সময়। দ্বিতীয় ধারাটিতে ছিলেন বস্তুবাদে বিশ্বাসী লেখকগণ। এদের মধ্যে যারাই সক্রিয় রাজনীতি করেছেন [জেনে রাখা দরকার সাচ্চা বস্তুবাদীকে রাজনীতি করতে হয়] তারা ভারতীয় কমিউনিস্টদলের সমর্থক কিংবা সদস্য হলেন। এই বিভাজনের পর বস্তুবাদী সাহিত্যের ক্রমবিকাশে আর ভাববাদী সাহিত্য বা সাহিত্যিক উল্লিখিত হবে না। কেননা, বস্তুবাদে বিশ্বাসী যারা তারাই এখন সাহিত্য সৃজন কাজে আত্মনিয়োগ করছেন, যেটা আগে ছিল না।

বলা হয় রাজনৈতিক মতবাদ প্রভাবিত কিংবা বিশ্বাসী লেখক সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন না। এটা যে ভাববাদীদের অভিযোগ তা বলাই বাহুল্য। অভিযোগটা আদৌ সত্য নয়। তা যদি হত, তাহলে গোর্কির 'মা' উপন্যাস বিশ্ববন্দিত হতে পারত না। বাংলা সাহিত্যে সতীনাথ ভাদুরী [১৯০৬—১৯৫২ একটি স্মরণীয় নাম। তার উপন্যাস জাগরী [১৯৪৫] একটি স্মরণীয় গ্রন্থ। উপন্যাস হিসেবেই এ-গ্রন্থ গ্রাহ্য এবং আদৃত। সতীনাথ ভাদুরী ছিলেন বিহার কংগ্রেস কমিটির অন্যতম পদাধিকারী। তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস সার্থক সাহিত্য সৃষ্টির অন্তরায় হয়নি। জনপ্রিয়তার পরিমাপে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে যারা লব-কুশ সেই শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্করও সক্রিয় রাজনীতি করেছেন।

কাজেই রাজনৈতিক বিশ্বাসের জন্যই বস্তুবাদীদের দ্বারা সৃষ্ট সাহিত্য রসমণ্ডিত হবেনা এ-কথা অশ্রদ্ধেয়। রবীন্দ্রনাথের সেই কথা, – "ভাবকে নিজের করিয়া অপরের করার নাম সাহিত্য বা ললিতকলা" এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। দেখতে হবে বস্তুবাদে বিশ্বাসী লেখক তার ভাব অপরের মধ্যে সঞ্চার করতে পারে কিনা। গোর্কি পেরেছেন। 'মা' তাই কালজয়ী উপন্যাস। সমস্যা সৃষ্টি করে বিচারকের মানস।

অবশ্য সিদ্ধান্ত নিয়েই যদি বিচারক বিচারের কাজটা শুরু করেন। বস্তুবাদী যে শ্রেণীকে সাহিত্যে আনে তার সঙ্গে ভাববাদীর থাকে অপরিচয়ের সমস্যা। দেব চরিত্র ত্যাগ করে প্রথম 'মানুষ' নায়কের আসন দখল করার সময়েও সমস্যা দেখা দিয়েছে। অনুরূপভাবে শোষক এবং উচ্চ শ্রেণীর পরিবর্তে শোষিত শ্রেণীর দ্বারা নায়কের স্থান দখল করায় একই সমস্যা দেখা দিলো। মানতেই হবে এরা, এই শোষিতেরা, আমাদের কাছে এতই অপরিচিত যে, এদের প্রেম বা ক্রোধের কথা আমাদের কাছে প্রচারই মনে হয়। ভিখিরির প্রেম। মাণিকের ভিখিরি নায়িকার প্রেম সংলাপ হলো—ঘা খান্ পামু কোথায়! ভাবতেই হয় এরা কোন জাতের প্রেমিকা কিংবা এটা কি প্রেম সংলাপ ?

বাংলা বস্তুবাদী সাহিত্যে প্রথম ও প্রধান পুরুষ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথা বলার আগে আমরা আবার গণ-কর্মসূচীর কিছু কথা বলা প্রাসঙ্গিক মনে করি ;

ব্রাসেলসে প্রেরিত সেই বার্তার অন্য স্বাক্ষরদাতাদের মধ্যে ছিলেন,—

নন্দলাল বসু, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, প্রেমচন্দ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, জওহরলাল নেহরু এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

নজরুলের দ্বারা ঐতিহ্য বিরোধী সংঘাতের ফল তখন ফলতে শুরু করেছে। প্রগতি সাহিত্যের জন্য লড়াই তখন জোরদার। যাঁরা তখন প্রগতি লেখক সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের অনেকেই হয়তো শিবির বদলেছেন। তবু, সেই প্রথম নিশান উড্ডীনের দিন যাঁরা জমায়েত হয়েছিলেন তাঁরা অবশ্য স্মরণীয়। ১৯৩৮-এ প্রগতি লেখক সম্মেলনের সভাপতি মণ্ডলীতে ছিলেন,—প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুধীন দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মুলকরাজ আনন্দ ও বলরাজ সাহনী। এক বছর আগে প্রগতি সংকলনের যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন,—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। এতেও ছিল রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ।

পরবর্তী কালে এতে যুক্ত হয়েছিলেন পণ্ডিত সুদর্শন এবং সমর সেন। ঢাকার সোমেন চন্দের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের পর এই সংঘের বাংলা শাখার নতুন নামকরণ হয়,—ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ। সভাপতি, অতুলচন্দ্র গুপ্ত। এছাড়া এলেন, বিষ্ণু দে, গোপাল হালদার, এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

১৯৪২-এ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সভায় সভাপতি ছিলেন —তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। আরো পাচ্ছি বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় অতুল বসু, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, আবুল মনসুর আহামদ ও শচীনদেব বর্মণকে। প্রতিযুক্তি সত্ত্বেও সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে ও সমর সেনকে প্রগতি কাব্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে।

'পদাতিক' এর কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় [১৯১৯] প্রথম সার্থক বস্তুবাদী কবি বলে একসময় বিবেচিত হতেন। "মার্কসবাদ আপ্তবাক্য নয় কর্মেরই পথ নির্দেশক" এটা জেনেই সুভাষ মার্কসবাদী দলে যোগ দেন এবং কাব্য রচনায় ব্রতী হন। সম্প্রতি সুভাষ লিখেছেন—

"আমাকে কেউ কবি বলুক
আমি চাই না।
কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত
যেন আমি হেঁটে যাই"

সুভাষ হাঁটছেন ঠিকই। সেই প্রসঙ্গে প্রশ্ন হলো সুভাষ কোন পথে হাঁটছেন? একদা বজবজ অঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সুভাষ আজ কোন ফ্রণ্টে কাজ করছেন? বস্তুবাদী কবিরূপে বিবেচিত হতে হলে এই প্রশ্নের উত্তরটা খুব জরুরী। যেহেতু তা আমরা পাইনি তাই এই পর্যায় সুভাষের আলোচনা অসমাপ্ত রইলো। তবুও বলবো, সুকান্তর সম্বন্ধে তাঁর উক্তি, "সমসাময়িকদের মধ্যে যে কাজ কেউ পারে নি, সুকান্ত একা তা করেছে"—তাঁকে বস্তুবাদী কাব্যালোচনায় স্মরণীয় করে রাখবে। সুকান্তর পক্ষে বিপক্ষে অনেক

কথা বলা হয়েছে। সুভাষের মূল্যায়ণ সেরা। সুকান্তর সার্থক মূল্যায়ণ বস্তুবাদী সাহিত্যে সুভাষের শ্রেষ্ঠ দান।

বস্তুবাদী সাহিত্যের কাব্যধারায় সুকান্তর আলোচনার আগে আরো কয়েকটি নাম উল্লেখ করতে চাই। প্রতিবাদের কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গণমনের কবি বিমল ঘোষ ও করণশংকর সেনগুপ্ত, তাত্ত্বিক কবি অরুণ মিত্র এবং দিনেশ দাস যিনি সদা সচেষ্ট, তাঁর রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন। কে ভুলতে পারে দিনেশ দাসের সেই কবিতা :—

"বাঁকানো চাঁদের সাদা ফালিটি
তুমি বুঝি খুব ভালবাসতে ?
চাঁদের শতক আজ নহে তো
এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে।"

এ কবিতা দিনেশ দাসকে কাস্তে কবিরূপে খ্যাতি এবং পরিচিতি দিল। কেনই বা দেবে না ? চাঁদ নিয়ে প্রথা বিরোধী উপমার সেইতো শুরু [১৯৩৮]। চাঁদ আর কাস্তে তারপর কতভাবেই না বাংলা সাহিত্য এসেছে।

অরুণ মিত্র আন্দোলন এবং আশাবাদকে কাব্যে আনেন সরাসরি,

"এ জ্বালা কখন জুড়োবে ?

পুরনো খবরের কাগজের পাতায় বলির তারিখগুলো চাপা পড়েছে। খালি হৃদয়ের বাঁচার আন্দোলনে তারা বেঁচে। শোভাযাত্রায় শোকযাত্রায় যন্ত্রণার মিলনে ভিতরে ভিতরে ফুঁসে-ওঠা ফুঁপিয়ে-ওঠা আবেগ শরীরের সমস্ত তন্তুতে থরথর করে।" কিংবা—

"হে বন্ধ্যা, তোমার গর্ভে যন্ত্রণা একবার নড়ুক"

প্রবন্ধ

বস্তুবাদীর সার্থকতম হাতিয়ার

কবিতার প্রতিকূলতা নেই গদ্যে। বিশেষ করে প্রবন্ধে। প্রতিবাদের ভাষা প্রবন্ধ। তামাম মানব সভ্যতায় যতবার যেটুকু প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে, প্রবন্ধে ধরা আছে তার ইতিহাস। সেটা মহদাশয় বিদ্যাসাগরের 'বিধবা বিবাহ'ই হোক কিংবা লুথারের [মার্টিন লুথার— ১৮৭৯ — ১৯৪৯] ধর্ম সংক্রান্ত প্রতিবাদ যাই হোক না কেন। প্রবন্ধ প্রতিরোধের অন্যতম মাধ্যম। অন্তমিলহীন কবিতার ভাষাও কঠিন। কিন্তু প্রবন্ধ কঠিনতর। ভাববাদীর কাছে কবিতা তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উৎস। বস্তুবাদীর এ ঐতিহ্য প্রবন্ধে। বস্তুবাদের আর এক নাম যুক্তিবাদ। প্রবন্ধ সেই যুক্তিকে ক্রম পরম্পরায় সাজিয়ে মানব-ইতিহাসকে নব-প্রজন্মের কাছে বহন যোগ্য করেছে। স্থিতি দিয়েছে, দিয়েছে সহন শক্তি। ফলে, পৃথিবীর ভাব-ভূমি হয়েছে চাষ যোগ্য চারণ ক্ষেত্র। ধর্ম আনে মানব মনে বিশ্বাস। বিশ্বাস ধারণ করে সংস্কার। সংস্কার আচার প্রধান। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। সংস্কারের বিশ্বাসে যে বস্তু মিলায় তার নাম ভাগ্য। মানুষের আপন ভাগ্য জয় করার শক্তি আছে যুক্তিতে। যুক্তির লড়াই তাই, সংস্কারের বিরুদ্ধে। যেহেতু সংস্কার ধারণ করে আছে ধর্মাচার, তাই যুক্তির লড়াই হলো ধর্মাচারেরও বিরুদ্ধে।

এ কাজটা বস্তুবাদী করে সর্বত্র। সবার আগে তা শুরু হয় প্রবন্ধে। তাই, বস্তুবাদী সর্বাধিক ঐতিহ্যবন্দী প্রবন্ধের কাছে। দাস ক্যাপিটাল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রতিবাদী সাহিত্য। কবিতা কিংবা গল্পেও বস্তুবাদীকে নতুন নতুন অনুষঙ্গাশ্রয়ী শব্দ সৃষ্টি করতে হয়। রূপক-উপমা-চিত্রকল্প তাও নতুন করে ভাবতে হয়। কিন্তু প্রবন্ধে তা নয়। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো বা তারও আগে থেকেই প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে প্রতিবাদী. শ্রেণী-চিহ্ন-যুক্ত ঐতিহাসিক কিন্তু ভাবোদ্দীপক অসংখ্য শব্দ। এই শব্দরাজি অমোঘ, তীক্ষ্ণ, দ্রুতগামী এবং

লক্ষ্যভেদী। বস্তুবাদী, প্রবন্ধে শব্দ ব্যবহারে এতটাই সার্থক এবং ঋজু যে, তা ব্যবহৃত হলেই বিরুদ্ধবাদীরা আতঙ্কিত হয়ে উঠে। বুর্জোয়া, শোষণ, শোষিত, শ্রেণীহীন, সর্বহারা, প্রতিক্রিয়াশীল, দ্বন্দ্বমূলক, বস্তুবাদ, বিনিময়, শ্রম, ফ্যাসিবাদ, সাম্যবাদ, পুঁজি, পুঁজিপতি, ধনতন্ত্র নৈরাজ্যবাদ ইত্যাদি শব্দ এই পর্যায়ে উল্লেখ করা যায়। এই সঙ্গে বলা যায় যে, শিল্প, সংস্কৃতি, শিক্ষা ইত্যাদি শব্দসমূহ যখন প্রতিবাদী সাহিত্যে ব্যবহৃত হয় তখন তাও বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় ব্যবহৃত শব্দের মতই অভিন্ন, অবিভাজ্য এবং অপরিবর্তনীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। এসব শব্দ তখন সিদ্ধরসের মর্যাদা পায়।

এ-কারণেই বস্তুবাদীর হাতে প্রবন্ধ যেমন সার্থকতম শিল্পকর্ম বলে বিবেচিত হয়, ললিত-কলার অন্য কোন শাখাই সেভাবে গ্রাহ্য হয় না। প্রবন্ধচর্চা, সার্থক বস্তুবাদীর অন্যতম অবশ্য কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়। এই অবশ্য কর্তব্য, বস্তুবাদীকে প্রজন্ম পরম্পরায় ব্যবহৃত বৃত্তির মত একটি সহজাত দক্ষতা দিয়েছে। ফলে, ভাববাদীরা বস্তুবাদী সৃষ্ট গল্প-কবিতা-উপন্যাস ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে অবিভাবকতা প্রকাশ করে থাকে, প্রবন্ধ-সাহিত্যের বেলায় তা করেনা কখনোই। আলোচনা করলে আমরা বাংলা সাহিত্যে বহু সার্থক বস্তুবাদী প্রবন্ধকার পাব। যাদের বস্তুবাদী বলা যাবে না, তাদের প্রবন্ধেও পিছুটান কম।

সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে, কুসংস্কার কিংবা ধর্মীয় সংস্কার যাই বলা হোক, তার মধ্যেই নিহিত বস্তুবাদী প্রবণতা। এই ধারায় অবশ্য স্মরণীয় রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দের মত মহান পুরুষেরা। সতীদাহের বিরুদ্ধে, বিধবা বিবাহের পক্ষে কিংবা শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ গঠনে তাদের প্রবন্ধে বস্তুবাদী চিন্তার সার্থক প্রকাশ। বিজ্ঞানকে লোকায়ত করার ক্ষেত্রে অক্ষয় কুমার দত্ত'র [১৮২০-১৮৮৬] অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বাস্তববাদী ভূদেব মুখোপাধ্যায় [১৮২৭-১৮৯৪] যুক্তিবাদী সংস্কার মুক্ত চিন্তা-চেতনা প্রকাশ ক্রমু করে মনের বিকাশে সাহায্য

করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উল্লিখিত হয়েছেন উপন্যাস প্রসঙ্গে। তাঁর বিজ্ঞান রহস্য, সাম্য এবং লোকরহস্যে বস্তুবাদী প্রবন্ধ বিকাশের উপাদান আছে। রবীন্দ্রনাথও ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছেন। কবির আত্মশক্তি, ভারতবর্ষ, শিক্ষা, রাজা-প্রজা, কালান্তর, সভ্যতার সংকট প্রভৃতি প্রবন্ধ ও গ্রন্থে আছে বস্তুবাদী চিন্তার চমৎকার প্রকাশ।

অন্যান্য বিষয়ের মত প্রবন্ধেও বস্তুবাদী ধারার জোয়ার এসেছিল বিংশ শতাব্দীতেই। রাজনীতিই শুধু নয়, সাহিত্যের ইতিহাসেও তার তীব্র প্রভাব অনুভূত হয়েছে। সাহিত্যের ইতিহাসে গোপাল হালদার, ইতিহাসে চিন্মোহন সেহানবীশ, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ও রাধারমন মিত্র রাজনীতি ও সাহিত্যে মুজফ্‌ফর আহম্‌দ, মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল, ভবাণী সেন, কাব্যে বিষ্ণু দে এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দর্শনে, সুশোভন সরকার ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অর্থনীতিতে, অমরেন্দ্র প্রসাদ মিত্র এবং সরোজ আচার্য, তাত্ত্বিক আলোচনায়, সরোজ দত্ত মার্কসীয় প্রবন্ধ সাহিত্যের মান খুবই উঁচুতে তুলে ধরেছেন।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রেষ্ঠ বস্তুবাদী ঔপন্যাসিক

বাংলা উপন্যাসের ক্রম বিকাশে একটা ছক দেখা যায়। সামন্ত-তান্ত্রিক পরিবেশ, বুর্জোয়া মানসিকতা এবং হিন্দু মধ্যবিত্তের মূল্যবোধ উপন্যাস রচনার প্রেরণারূপে কাজ করেছে। ব্যতিক্রমহীন সূত্র এটা নয়। সমকাল অপেক্ষা অতীত লেখকদের বেশী আকর্ষণ করেছে। অতীতচারী হওয়ার সুবিধা অনেক। বিচারের মানদণ্ড-রূপে সময়কে ব্যবহার করা যায়। এভাবেই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকার পাওয়া তো কম পাওয়া নয়। সমসাময়িক ঘটনার শৈল্পিক বিবরণ দান যারপর নাই কঠিন কাজ। যখন বাদ-প্রতিবাদ চলছে, তখন পরিণাম ঘোষণার দায় বহন স্থিতপ্রাজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। স্ব-স্বার্থ ব্যহত হতে পারে পদে পদে পদে। সে ঝুঁকি তো সকলে নেয় না! সর্বোপরি আছে 'মহাকাল'—শেষ বিচারের ন্যায়দণ্ড তার মুঠোয়। তাই, সমকালকে ব্যাখ্যার দায় অনেকেই নিতে চান না। এসব জেনেও কিছু দুঃসাহসী, নাছোড়বান্দা এবং সর্বত্যাগী মানুষ সর্বকালেই পাওয়া যায়। এই অপ্রিয় কাজের দায় বহন করে তারাই। পারিতোষিকের প্রলোভন পরিত্যাগ করে। এই প্রতিবাদের নদী পথই অবশেষে বস্তুবাদের সাগরে লীন হয়ে যায়। বাংলা সাহিত্যেও এর অন্যথা হয়নি। তার ক্রমবিবর্তন আমরা দিয়েছি প্রধান প্রধান লেখকদের সাহিত্যালোচনার সময়। প্রধান লেখকের পর্যায় পড়েনা এমন কয়েকজন লেখকের গুটি কয়েক বই, এই প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবি রাখে। বস্তুবাদের ক্রমবিকাশে এদের অবদানও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বস্তুবাদ সর্বত্রই যে ক্রমবিকাশেরই সার্থক পরিণতি এই বৈজ্ঞানিক সত্যটিও এর দ্বারা প্রমাণিত হবে। মাণিক প্রসঙ্গে তাই, কয়েকটি বিশেষ বইয়ের কথা বলা হচ্ছে।

সেকালের ধনীদের মধ্যে ধনী ছিলেন যিনি সেই স্বল্পায়ু কালীপ্রসন্ন সিংহ, [হুতোম প্যাঁচা ১৮৪০—১৮৭০] 'হুতোম

প্যাঁচার নক্‌শা' নামে বইয়ে কলকাতার সমাজচিত্র আমাদের উপহার দিয়েছেন। এতে ব্যবহৃত হয়েছে সেকালের কলকাতার চলিত বুলি। তিনি সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী, ধর্মাচার বিরোধী এবং ধনী-সমাজের কুৎসিত জীবন-যাপন-বিরোধী বক্তব্য রেখেছেন। তার প্রচেষ্টা ছিল দুঃসাহসিক। তিনি সার্থক প্রতিবাদী।

হানা ক্যাথেরীন মুলেন্সের লেখা 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' [১৮৫২] নিশ্চয়ই উপন্যাস নয়। বোধকরি তিনি উপন্যাস রচনা করতে চাননি। এ-বইয়ে পাওয়া গেল সরল ভাষার সরসতা এবং উপযোগিতার পরিচয়। কেবলমাত্র ভাষার প্রসাদগুণে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় সামাজিক জীবনের কথা তামাম বাঙালীর কাছে স্মরণীয় হয়ে রইল। প্যারীচাঁদ মিত্র [টেকচাঁদ ঠাকুর ১৮১৪-১৮৮৩] বাংলা ভাষায় প্রথম উপন্যাস রচনা করেন। তাঁর উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল' তৎকালীন সমাজ জীবনের বাস্তব জীবন চিত্র। এতেই প্রথম সাধুরীতির মধ্যে কথ্য বুলির ব্যবহার সার্থকতা লাভ করেছিল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী [১৮৫৩—১৯৩১] দুটি উপন্যাস লিখেছিলেন। এর মধ্যে 'বেণের মেয়ে' সার্থকতালাভ করেছে সমাজ চিত্র চিত্রনে।

বাংলা সাহিত্যে এই ধারাটি তেমন করে অনুশীলিতই হলো না জগদীশ গুপ্ত শরৎচন্দ্রের সময়েই এই ধারাটি চালু রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক' এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লাকুঠির দেশ'—এই প্রসঙ্গে অবশ্য স্মরণীয়। এই ধারা এঁরা অব্যাহত রাখেননি। সতীনাথ ভাদুরীর 'জাগরী' ও 'ঢোঁড়াই চরিত-মানস', প্রাক্ বস্তুবাদী ধারায় সার্থক বস্তুবাদী কাহিনী। এইভাবেই, অভিজ্ঞতা প্রকাশের অন্তর-তাগিদে, কখনো সৃষ্টির নেশায় এবং সর্বোপরি আদর্শের টানে অবশেষে বস্তুবাদী উপন্যাস এলো বাংলা সাহিত্যে।

এই ধারার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর জীবন বৈচিত্র্যময়। ট্রাজেডির নায়কের মত বিস্ময়কর ঘাত-প্রতিঘাতে

পূর্ণ। সে-কাহিনী এবং মাণিকের সৃষ্টি এবার আমাদের আলোচনার বিষয়।

বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ বস্তুবাদী কবি নির্বাচনে বিতর্ক হলেও হতে পারে। বিতর্কের প্রচেষ্টা অশ্রদ্ধেয় বলে বিবেচিত হবেই, যদি মাণিক বন্দ্যোপাধ্যাযকে [১৯০৮—১৯৫৩] শ্রেষ্ঠ বস্তুবাদী ঔপন্যাসিক বলতে কেউ দ্বিধা প্রকাশ করেন। সাহিত্য ভূমিতে তার আত্মপ্রকাশ ছোটগল্পের মাধ্যমে। তখন মাণিক প্রেসিডেন্সি কলেজের বি, এস, সি, [গণিতে সাম্মানিক] শ্রেণীর ছাত্র। বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক করে গল্প লেখেন এবং তা ছাপাও হয়। মাণিকের পাঠকমাত্রেই আশা করি জানেন যে, তাঁর সেই গল্পটির নাম 'অতসী মামী'।

পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র পঁচিশ টাকা মাসিক বেতনে কেরানীর কাজের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। অবসর গ্রহণ করেন সাব ডেপুটি কালেক্টর রূপে। উচ্চবিত্ত পরিবার এঁদের বলা যাবে না। আবার বিত্তহীনদের দলেও এঁদের ফেলা চলে না। মাণিক নানা কারণে বিত্তহীনের জীবনই কাটিয়ে গেলেন। তীব্র অর্থ কষ্ট তাঁকে দারিদ্র্য-বিলাসী করতে পারত। মাণিকের জীবনে দারিদ্র্য হয়েছে শিক্ষার সোপান।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্ম জীবন শুরু ১৯৩৪-এ। বঙ্গশ্রী পত্রিকায় সহকারী সম্পাদকের পদে ৬৫ টাকা মাসিক বেতনে তিনি কাজ করতেন। ১৯৩৭-এ ২৯ বছর বয়সে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিবাহ করেন। ঔপন্যাসিক রূপে তখন তিনি সুপরিচিত। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে আছে,—জননী (১৯৩৫) দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫—এটি লেখা হয়েছিল লেখকের ২১ বছর বয়সে), পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬) পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬) জীবনের জটিলতা (১৯৩৬) ও প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭)। মানিক সম্বন্ধে কিছু অভিযোগ উচ্চারিত হয়। তিনি মদাসক্ত ছিলেন, এটা একটা অভিযোগ। সাধারণভাবে মদ্যপান ঠিক অপরাধ নয়। যদিও বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে,

মাণিক প্রসঙ্গে, এটা অভিযোগ বলতেই হবে। মানিক প্রথম জীবনে ফ্রয়েড ভক্ত ছিলেন [সিগমুণ্ড ফ্রয়েড—১৮৫০-১৯৩৯] মাণিকের 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসের কথা মনে করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ মানুষের অতীত দেখে তাকে বিচার করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। বরং কবি মনে করতেন, কতটা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে ব্যক্তির বর্তমান রূপ তাই বিবেচ্য। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বুদ্ধদেবের [গৌতম বুদ্ধ খৃঃ পূঃ ৫ম শতক] বিবর্তনের উদাহরণ দিয়েছেন। মাণিকের প্রতিকূলতা অতিক্রমের অভিযান, জীবন সংগ্রাম ও তার পরিণতিই আমাদের বিবেচ্য। এবং তার শ্রেণীচ্যুত হওয়ার সংগ্রাম আর তাতে সাফল্য লাভই আমাদের আলোচ্য।

১৯৪৪ সালে মাণিক কমিউনিস্ট দলে যোগ দেন। অর্থাৎ ৩৭-এর পর আরো সাত বছর কেটে গেছে। মাণিকের বয়স তখন মধ্য চল্লিশ। মার্কসবাদে দীক্ষা তাই, মাণিকের ক্ষেত্রে কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। এটা ভাবাবেগ জনিতও বলা যাবে না। বুদ্ধি দিয়ে বিচার করেই তিনি এটা করেছিলেন। মানিককে কখনো দল ছাড়তে হয়নি। স্বীকারোক্তি দিতে হয়নি। দলবিরোধী কাজের জন্য অভিযুক্তও হতে হয়নি। অন্য দেশ বা এ দেশের অন্য রাজ্যগুলির কথা বলতে পারব না। এ-রাজ্যে ললিতকলা চর্চাকারী বস্তুবাদীদের ক্ষেত্রে মাণিক এ-প্রসঙ্গে একটা উদাহরণ। কোন ভয় বা প্রলোভন মাণিককে আপন বিশ্বাসে আস্থাহীন করতে পারেনি।

মার্কসবাদ যে মাণিকের কাছে কেবল আপ্ত বাক্য মাত্র নয় বরং কর্মেরই পদ্ধতি তাও তিনি মেনে নিয়েছেন। "মার্কসবাদ ঘাঁটতে ঘাঁটতে যখন আমার এতদিনের লেখার ত্রুটি আর দুর্বলতাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল…তখন উপরের ওই সূত্র ধরেই আমি অকারণ আত্মগ্লানির হাত থেকে রেহাই পাই,…' স্মরণীয়, মাণিক কমিউনিস্ট দলের সদস্যপদ লাভের আগেই আরো কয়েকটি উপন্যাস ও গল্প সংগ্রহ প্রকাশ করেন। এই পর্বে, উত্তর বিবাহ এবং প্রাক্ সদস্যপদ লাভ, লিখেছেন, অমৃতস্য পুত্রাঃ (১৯৩৮) মিহি ও মোটা কাহিনী (১৯৩৮),

সরীসৃপ (১৯৩৯) সহরতলী (১৯৪০-৪১) অহিংসা (১৯৪১) ধরাবাধা জীবন (১৯৪১) বৌ (১৯৪৩) প্রতিবিম্ব (৯৪৩) সমুদ্রের স্বাদ (১৯৪৩) ও ভেজাল (১৯৪৪)।

অর্থ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। একজন বস্তুবাদীর লক্ষ্য হবে ঐ নিয়ন্ত্রিত অর্থ ব্যবস্থা সার্থক ভাবে এবং মানুষের কল্যাণের কাজে ব্যবহার করা। বস্তুবাদী সাহিত্যে থাকবে এই চেতনার প্রকাশ ও উদ্দেশ্য সাধনে সাহিত্যকে হাতিয়ার রূপে ব্যবহারে নিরলস প্রচেষ্টা। কৃষকের হাতে কাস্তে, শ্রমিকের হাতে হাতুড়ি, শিল্পীর হাতে তুলি এবং লেখকের হাতে কলম শুধু আলাদা মাধ্যম। লক্ষ্য অভিন্ন।

মাণিক তিরিশের দশকের লেখক। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ এ সময়ের লেখকের কাছে শ্রুতি নয় স্মৃতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এদের কাছে স্মৃতি নয় দুঃসহ বাস্তব। চল্লিশের লেখকেরা তো শুধু বিশ্ব যুদ্ধই দেখলেন না। দেখলেন দেশকে স্বাধীন-হতে। মাতৃ ভূমিকে দ্বিখণ্ড করণের দর্শকমাত্র তাঁরা নন। শরিকও। যুদ্ধ চলাকালীন মনুষ্য সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের অনাহারক্লিষ্ট সচল কঙ্কালের মহামিছিলের সে অংশীদার। চল্লিশ এবং পঞ্চাশের বাঙালী—ধর্ম তার যাই হোক, যে-প্রশ্নের উত্তর দিতে সে দায়বদ্ধ, তা হলো, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তার ভূমিকা কী ছিল? দর্শকের? অংশ গ্রহণকারীর? না কি প্রতিবাদীর?

১৯৩৬-এ লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস অধিবেশনকালে মুন্সী প্রেমচন্দের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৪৪-এ সংঘের বার্ষিক সম্মেলনে মানিক সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য হন। দলের নির্দেশে মাণিক ছিলেন সংস্কৃতি শাখার সঙ্গে যুক্ত। তবুও, কৃষক আন্দোলনেও তিনি অংশ নেন। সংস্কৃতি বিভাগের কর্মী হিসেবে রোজেনবার্গ দম্পতির ফাঁসির প্রতিবাদ করেন। ১৯৫৩—এ স্তালিনের জন্য অনুষ্ঠিত শোক সভায় যোগ দেন এবং শোক মিছিলে পথ পরিক্রমা করেন পায় হেঁটে। আবার বিনা বিচারে আটক আইনের প্রতিবাদ করেন। ট্রাম শ্রমিকদের প্রতিবাদের তিনি

শরিক। চিয়াং কাইশেকের পতনে তার উল্লাস প্রমাণ করে তিনি আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গে সচেতন।

১৯৪৬-এ কলকাতায় ডাইরেক্‌ট অ্যাক্‌শন্‌ ডে'তে মাণিকের প্রতিক্রিয়া—"পাড়ার ছেলেরা উত্তেজিত হয়ে ডিফেন্স পার্টি গড়ছে। কি হচ্ছে বুঝতে না পেরে ছোঁয়াচ লেগে—নার্ভাস হয়ে পড়লাম।" আবার লিখছেন, "রাত ১০টায় পার্টির দুইটি ছেলে এলো। পীস্‌ কমিটি গঠনের চেষ্টা হচ্ছে—সকালে যেতে হবে। ওদের সঙ্গে কথা বলে মনের ভাব বদলে গেল। যতই গুরুতর হোক অবস্থা, হাল ছাড়বার দরকার নেই।"

ঔপন্যাসিক মাণিকের কাছে প্রত্যাশা, তার এই প্রয়াস সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হবে। মাণিক ছিলেন স্বল্পায়ু। মাত্র ৪৬ বছর বেঁচে ছিলেন তিনি। প্রথম উপন্যাস জননীর প্রকাশ কাল ধরলে বছর পঁচিশেক তিনি পেয়েছিলেন সাহিত্য সৃষ্টির জন্য। এই পঁচিশ বছরের অনেকটাই ব্যয় হয়েছে অর্থচিন্তা, পারিবারিক অশান্তি মোকাবিলা ও মৃগী রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করে। তাঁর জীবনের একটা বৃহৎ অংশ গেছে দলের কাজে। এরি মধ্যে তিনি রচনা করেছেন, পঁয়ত্রিশটি উপন্যাস, প্রকাশ করেছেন যোলটি গল্প সংকলন, একটি প্রবন্ধ সংকলন ও নাটক এবং কিছু কবিতা। সংগীত চর্চাও তিনি করতেন। পারতেন বাঁশী বাজাতে। তাঁর প্রথম গল্প অতসীমামীতে সঙ্গীতময় জীবনচর্চার প্রভাব দেখা যায়।

মাণিক ছিলেন রোম্যান্টিক। যেমন ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। রোম্যান্টিকতা অতিক্রম করার প্রতিশ্রুতি ছিল তাঁর প্রথম উপন্যাসেই। এই উপন্যাস প্রসঙ্গে আমাদের তারাশঙ্করের কথাও মনে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র ভাববাদী রোম্যান্টিক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত স্থায়ী বলেই ভাবেন। যুক্ত হন সামন্তবাদী ধারার সঙ্গে। রাজনীতি করা তারাশঙ্কর, রাজনীতিতে বিশ্বাস হারিযে ব্যক্তির মধ্যেই মানবসমাজকে ধরতে চান। ব্যক্তি প্রাধান্য সামন্তবাদী সমাজের লক্ষণ। শরৎচন্দ্রও মূলতঃ এই ধারারই লেখক। এঁদের বিশ্বাস সমষ্টি অপেক্ষা ব্যষ্টি ভিত্তিক।

একমাত্র ব্যতিক্রম সেই তিনি—রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ জানেন সামন্তবাদী সমাজ অতীত মাত্র। চলতি সমাজ বুর্জোয়া প্রধান। শ্রেণী বিভক্ত। সংগ্রাম এবং শ্রেণীহীন সমাজের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ সমাধান খুঁজেছেন বিশ্ববোধের মাধ্যমে।

বিশ্ববোধ বস্তুবাদীরও কাম্য। যদিও বস্তুবাদী বিশ্বাস করে শ্রেণী সমন্বয় নয় শ্রেণী দ্বন্দ্বের মাধ্যমেই বিশ্ববোধ আসবে। একারণেই কল্লোলের নব-সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য এবং প্রতিবাদী সাহিত্যের যুগেও মাণিক নব-প্রতিবাদী। শরৎচন্দ্র কিংবা তারাশঙ্কর তাঁকে প্রভাবিত করেনা। রবীন্দ্রনাথের পাশেও মাণিক স্বতন্ত্র। তাঁর লেখার বিবর্তন একটা নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র। গণিত তাঁর প্রিয় বিষয়। পরপর প্রকাশিত বইগুলি একটা ছক মেনে প্রস্ফুটিত হয়েছে। তাঁর লেখায় পাই মানুষ, তার মন, মানবীয় প্রেম, সমাজ, শ্রেণীচেতনা, সংগ্রাম এবং শোষিতের বিজয় কথা।

'জননী' নামটি আমাদের মনে 'মা' উপন্যাসের স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। ঐটুকুই। আর কোন মিল নেই। শ্যামা এবং শীতলের জীবন কথার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে একটা আস্থা এনে দিতে চেয়েছেন লেখক। শ্রেণী সংগ্রামের চিত্র নেই। সেটা নেই পদ্মানদীর মাঝিতেও। কুবের কোন প্রতিবাদী চরিত্র নয়। বরং সে আত্মসমর্পণ করে বাঁচতে চায়। এরা, এই জেলেরা, বাংলা সাহিত্যে এত বাস্তব স্থির চিত্র হয়ে এর আগে আসেনি।

পুতুল নাচের ইতিকথায় মাণিক গ্রাম্য মধ্যবিত্ত জীবনের কথা বলেছেন। তিমি নাকি কলকাতায় এক পুতুল নাচের অনুষ্ঠান দেখে এই উপন্যাস লেখার অনুপ্রেরণা পান। এতে আছে সামন্তবাদী মূল্য বোধ মুক্ত মানুষ। পরিণামে শশীর উপলব্ধির মধ্য দিয়ে এই বিশ্বাসই যেন স্থায়ী হয়—গ্রাম আর আগের মত নেই। হবেও না। পুতুল নাচের ইতিকথা মাণিকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে অনেকে মনে করেন। এর মধ্যে বালজাকের প্রতিচ্ছায়াও দেখেন অনেকে। বস্তুবাদী

দৃষ্টিকোণ থেকে এ উপন্যাসের মূল্য অন্য দিক থেকে। মাণিক এবার শহরমুখী হবে। বুর্জোয়া সমাজের প্রাণ ঐ শহরে। সেখানে শুরু হবে শ্রেণী সংগ্রাম। পুতুল নাচের ইতিকথা মাণিকের বস্তুবাদী লেখক সত্তার ভূমিকা।

দ্বিতীয় পর্বে মাণিককে আমরা শ্রমিকের কাছাকাছি দেখতে পাচ্ছি। এই পর্বের তিনটি উপন্যাস অহিংসা, সহরতলী [২টি খণ্ড] এবং প্রতিবিম্ব। সহরতলীর যশোদা সত্যপ্রিয়র কাছে হেরে সহরতলী ছাড়ে। রোম্যান্টিক কোন প্রভাব নেই এখন আর। রোম্যান্সহীন প্রেমের চূড়ান্তরূপ আছে পাশাপাশি উপন্যাসে। মাণিক এখন সাধারণ পাঁচজনের একজন। মূলতঃ শ্রমিকের প্রতিনিধি। বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন খাত সৃষ্টি হচ্ছে। বিতর্কও। এবং সেই সঙ্গে বস্তুবাদী সাহিত্যের অবয়ব পূর্ণতা পাচ্ছে। নিজস্ব রূপ নিচ্ছে।

সহরতলীতে মধ্যবিত্ত মানসিকতা এবং বুর্জোয়া জীবন, যে জীবনের আর এক নাম সহুরে জীবন তার অসঙ্গতি প্রকটিত। অহিংসায় তার দগদগে রূপ দেখা যাচ্ছে। ধর্মজীবনের বাহিরেটা দেখি আমরা। রবীন্দ্রনাথের রাজসিংহ এই প্রসঙ্গে মনে আসবেই। সদানন্দকে মহামানব সাজিয়ে বিপিনের লোলুপ এবং হীন জীবন চর্চা এতে বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয় পর্বে মাণিক কৃষক এবং শ্রমিক এই দুই শ্রেণীকেই এনেছেন বিপ্লবের হাতিয়াররূপে। মধ্যবিত্তের চিত্রে আছে শ্রেণীচ্যুত হওয়ার জন্য আত্মবিশ্লেষণ।

তৃতীয় বা শেষ পর্যায় মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাচ্চা বিপ্লবী সাহিত্যিক। রাজনীতি, সমাজনীতি এবং অর্থনীতি সম্বন্ধে বস্তুবাদী দর্শনের আলোচনা পর্যাপ্ত। শিল্প-সাহিত্য প্রসঙ্গে আলোচনা তুলনা মূলকভাবে কম। বিষয়টি উপেক্ষিত হয়নি। বস্তুবাদী সাহিত্যিকের অবশ্য মান্য শর্ত কী? মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য সৃষ্টির তৃতীয় পর্যায় বিশ্লেষণের ভূমিকা হবে এই শর্ত বা শর্তগুলি। কার্ল-মার্কস্ বলেছেন, "সৌন্দর্যের নিয়ম অনুসারেই মানুষ সৃষ্টি করে।"

সৌন্দর্যের অবয়ব ধরা সহজ নয়। সমাজ গ্রাহ্য রূপই কাম্য ; কেননা তা সময়ের বিচারে স্থায়ী হয়েছে। একারণেই সম্ভবতঃ মাও সে তুং বলেছেন,—"সমালোচনার মধ্য দিয়ে আমাদের শৈল্পিক সাহিত্যিক ঐতিহ্যের যা কিছু সুন্দর সে সবই গ্রহণ করব।' স্মরণীয় এবং অবশ্য মান্য লেনিনের উক্তি,—'আমরা কমিউনিস্টরা সংস্কৃতিতে রক্ষণশীল।' তিনি আরো বলেছেন,—"মানব সমাজের সমগ্র বিকাশের মধ্য দিয়ে যে সংস্কৃতির সৃষ্টি তার নিখুঁত জ্ঞানকে ভিত্তি করেই শ্রমিক সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে।" মনে রাখতে হবে মার্কস বিটোভেনের সিম্‌ফনি শুনতেন। তিনি গ্যেটের এবং অন্য ভাববাদী সাহিত্যিকদের সৃষ্টি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বোঝাতেন।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন ১৯৪৪-এ। ১৯৪৫-এ প্রকাশিত হয় দর্পণ উপন্যাস। নীলদর্পণে দীনবন্ধু মিত্র নীলকর সাহেবদের প্রতিবিম্ব দেখিয়েছিলেন। দর্পণে পাই শ্রমজীবি —কৃষকের প্রতিবিম্ব। পুতুলনাচের ইতিকথার পর মাণিক আরো দুটি ইতিকথা লিখেছেন। ১৯৪৬-এ 'সহরবাসের ইতিকথা' এবং ১৯৫২-এ 'ইতিকথার পরের কথা'। ইতিকথার পরের কথার নায়ক 'শুভ'। এটিকে অনেকে তাত্ত্বিক বই মনে করেন। এতে উত্তর স্বাধীন ভারতবর্ষে এক উচ্চশিক্ষিত বিজ্ঞানীর হতাশার কথা বলা হয়েছে। সহরবাসের ইতিকথায় মোহনের গ্রাম ছেড়ে সহরে বাস করার কাহিনী বলা হয়েছে। গ্রাম এবং সহর জীবনের বৈপরীত্য আছে এতে। সহর জীবন সম্বন্ধে মার্কসীয় চিন্তা এবং বিশ্লেষণ এ-বইয়ে চমৎকার ফুটে উঠেছে। গণ-আন্দোলনের উপর নির্ভর করে লেখা হয়েছে 'চিহ্ন' উপন্যাস। যার পটভূমিকায় আছে বোম্বাই-এ ১৯৪৬-এর নৌ-বিদ্রোহ। ভারতবাসীর স্বাধীনতার জন্য অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও সাহসিক প্রতিক্রিয়া এই বিদ্রোহ। তার ছায়া পড়েছে এই উপন্যাসে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও সমকালকে ধরতে চেয়েছিলেন তাঁর ঝড় ও ঝড়া পাতা উপন্যাসে।

মাণিক পার্টিকে কতটা ভালোবেসে ছিলেন তার স্থির চিত্র,

'আদায়ের ইতিহাস' উপন্যাস। নায়ক ত্রিষ্টুপ যুবক। পেশায় কেরাণী। স্বভাবে গোঁয়ার। সে চায় বিয়ে করতে মনীশের বোন কুন্তলাকে। মনীশ বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী। কুন্তলাও তাই। কুন্তলা বিয়ের প্রস্তাবের উত্তরে বলছে :

"আপনি ঠিক করেছেন বড় হবেন। টাকা-পয়সা, মান সম্ভ্রম, এ-সব নিয়ে যারা বড় হয়, দাদার কাছে তাদের কোন দাম নেই। আপনি একগুঁয়ে মানুষ, যা ধরবেন তা ছাড়বেন না। একদিন মস্ত লোক হবেন, মোটর হাঁকাবেন, দেশ জুড়ে খ্যাতি লাভ করবেন—এই আপনার প্রতিজ্ঞা। আপনার সঙ্গে আমার কখনও বিয়ে হয় ?"

"কেন ?"

"আমাদের ছক আলাদা। আমরা অন্য প্রতিজ্ঞা করেছি—জীবন দিয়ে কী আদায় করব।"

"কি আদায় করবে ?"

"স্বাধীনতা"। কুন্তলার কাছে ত্রিষ্টুপ নতুন ভাবে আদায়ের ছক কাটার প্রতিশ্রুতি দিল। সেও স্বাধীনতার জন্য লড়বে।

দাঙ্গার পটভূমিকায় তিনি লিখেছেন 'স্বাধীনতার স্বাদ'। মাণিক বলছেন, দেখা যাবে, "মজুর শ্রেণী সবচেয়ে বেশী দাঙ্গা বিরোধী"। পরবর্ত্তী পর্যায় সোমেন চন্দের আলোচনা প্রসঙ্গে এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে। পাশাপাশি উপন্যাসের নায়ক সুনীল। বস্তুবাদী জীবনচর্চা, উত্তর স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবাদপত্র, মালিক ইত্যাদি প্রসঙ্গে মাণিক তার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন এই উপন্যাসে। প্রেম যে দুটি জীবনের অভিজ্ঞতার মিলন, বুদ্ধির মিলন, একান্ত দৈহিক মিলন নয়, তার বুদ্ধিদীপ্ত চিত্র এই গ্রন্থ।

মাণিকের উপন্যাসের সাহিত্য মূল্য নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। আছেও। কিন্তু তবুও তিনি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বস্তুবাদী ঔপন্যাসিক। কেননা, তিনি বস্তুবাদী সাহিত্যিকের পালনীয় দুটি শর্তই নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। তিনি ব্যবহারিক জীবনে সামাজিক দায় বহন করেছেন এবং সাহিত্যে সেই দায়ের বিশ্লেষণ করেছেন সততার সঙ্গে।

'মার্কসবাদ আপ্ত বাক্য নয়, কর্মেরই পথ নির্দেশক' এই তত্ত্বে বিশ্বাসী ও অনুসরণকারী দ্বিতীয় যে ঔপন্যাসিককে আমরা পেয়েছি তিনি হলেন, গোপাল হালদার। সমকালের দলিলরূপে বিবেচিত হবে তার উপন্যাসত্রয়ী,—একদা (১৩৪৬) অন্যদিন (১৯৫০) এবং আর একদিন (১৩৫৮)। প্রচলিত আছে একটি ধারণা যে, রোমানদের লেখা উপন্যাস পড়া হয় রোমের ইতিহাস জানার জন্য কিন্তু গ্রীসের ইতিহাস পড়া হয় উপন্যাস পড়ার স্বাদ পেতে। গোপাল হালদারের উপন্যাস প্রসঙ্গে একথাটি অনেকের মনে হতেই পারে। লেখক কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য—কর্মী এবং নেতা। শুধু উপন্যাস নয় তিনি প্রাবন্ধিকও। তার লেখা বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা উপন্যাসোপম প্রসাদগুণ সম্পন্ন সাহিত্যের ইতিহাস পুস্তক।

গোপাল হালদারের উপন্যাস আছে বুদ্ধির খেলা। সহুরে বুদ্ধিজীবি এবং পার্টি কর্মীরাই তার উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী। তাদের কথা এবং পারবেশ বর্ণনার মধ্যে আছে প্রাক্ স্বাধীন ও স্বাধীনতা উত্তর কমিউনিস্ট দলের কর্মীদের আদর্শ নিষ্ঠার কথা। সেই সঙ্গে পাওয়া যায় সেই সময়ের সহুরে সমাজের চিত্র। কতটা প্রতিকূলতার মধ্যে কাজ করতে হয়েছে সে সময় কমিউনিস্ট দলের কর্মীদের, তার দলিল চিত্র যেন তাঁর উপন্যাস। অমিতের মত মননশীল কমরেডদের কথা শ্রীহালদার যত বলেন, ততটা বলেন না শ্রমিক কৃষকের কথা। বিশেষ করে বাঙালীর একটা মোহ আছে গ্রাম জীবনের প্রতি। নাড়ীর যোগ। শ্রীহালদারের লেখায় সেইটা না পেয়ে পাঠক কিছুটা যেন আশা হত। পাশাপাশি এটাও সত্য, বামপন্থীদের অসাম্প্রদায়িক চরিত্র সুপরিচিত,—শ্রীহালদার তার সার্থক কথক। কংগ্রেসী শাসনে কমিউনিস্টদের স্থান ছিল কারাগারে। কারাজীবনের বাস্তব চিত্রাঙ্কনে গোপাল হালদার সিদ্ধহস্ত। তার উপন্যাসের পটভূমি কারাভূমিতে বিস্তৃত এবং তা থেকে উঠে এসেছে নানা চরিত্র। গোপাল হালদার কোন কোন ক্ষেত্রে মাণিক বন্দোপাধ্যায়ের পরিপূরক।

সোমেন চন্দ

কর্মে ও কথায় অভিন্ন

সার্থক বস্তুবাদী সাহিত্য রচনায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় অনতিক্রম্য। গোপাল হালদারের সার্থকতা এবং সীমাবদ্ধতা পূর্বেই আখ্যায়িত হয়েছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৩২৫—১৩৫৮) বামপন্থী লেখক ছিলেন কিন্তু বস্তুবাদী লেখক ছিলেন না। এই পর্যায় তিনি তাই আমাদের আলোচনায় আসবেন না। সমরেশ বসু (১৯২৪—১৯২৫) বস্তুবাদী কথাসাহিত্যিকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি কমিউনিস্ট দলের সদস্য ছিলেন। ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তার লেখা প্রথম দুটি গল্প—'শের সর্দার' ও 'আদাব' বামপন্থীদের কাগজ, যথাক্রমে স্বাধীনতা ও পরিচয়ে প্রকাশিত হয়। কমিউনিস্ট কর্মীরূপেই তিনি কারাগারেও ছিলেন। যথার্থ শক্তিশালী লেখক সমরেশ ১৯৫৬-র পর সাম্যবাদী আন্দোলন থেকে দূরে সরে যান এবং কমিউনিস্ট দলের সদস্য পদও ছেড়ে দেন। তিনিও তাই, আমাদের আলোচনায় আর আসবেন না। বস্তুবাদী ঔপন্যাসিকরূপে স্মরণীয় "লেখা নেই স্বর্ণাক্ষরে" ও "মরিয়ম" স্রষ্টা গোলাম কুদ্দুস।

বস্তুবাদী কথাসাহিত্যিকরূপে সোমেন চন্দই (১৯২০—১৯৪২) হবেন আমাদের আলোচনায় শেষ গল্পকার। সোমেনের পর বহু বস্তুবাদী কথাসাহিত্যিক লিখেছেন বা লিখছেন। কিন্তু সোমেনের পর আর এ-বইয়ে আলোচনা করা হবে না। এটা নিশ্চয়ই বলতে পেরেছি যে, বাস্তববাদী চিন্তা-চেতনা প্রথম থেকেই বাংলা সাহিত্যের অন্যতম ভাব-উপাদান ছিল। হয়ত লেখকেরা এটা সব সময় সচেতন-ভাবে করেন নি। তীব্র দারিদ্র্য, সবলের অত্যাচার ও নির্মম শোষণের প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ এটা। অত্যাচার কিংবা শোষণের বিরুদ্ধে বলতে হলে লেখায় শ্রেণী-প্রতিনিধিত্ব এসে যায়। দারিদ্র্যের কারণ খুঁজতে গেলেই ধনীর সঞ্চয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হয়।

সামন্তপ্রভুর চক্রান্তের শরিক হতে না চাইলেই প্রভুর কোপদৃষ্টিতে পড়তে হয়। শোষণ ও অত্যাচার বাঙালীর সমাজ ব্যবস্থায় এত বেশী ছিল যে তা কোন লেখকের পক্ষেই, একেবারে উপেক্ষা করা সম্ভব হয় নি। এখনও হয় না। ভাববাদী লেখকগণও হর-হামেশা প্রতিবাদী চরিত্র সৃষ্টি করছেন।

একারণেই ধর্মীয় অনুশাসনে বাধা চর্যাকারগণও বাস্তব জীবন বর্ণনা প্রসঙ্গে অবিচারের উল্লেখ করেছেন। অজ্ঞেয়বাদী বিদ্যাসাগর, রোম্যান্টিক বঙ্কিমচন্দ্র, সমাজ সংস্কারক বিবেকানন্দ, বিশ্বমানবতায় বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ, কংগ্রেস সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত শরৎচন্দ্র—তারাশঙ্কর—সতীনাথ কেউই এই বাস্তবতা উপেক্ষা করতে পারেন নি। একে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা বলা যাবে না। কিন্তু বস্তুগত বাস্তবতা বলতেই হবে। নবজীবনের রূপরেখা কল্পনা করলেই কাজ শেষ হলো না তার সার্থক প্রয়োগও করতে হবে।

"অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।"

এ-হলো অসম্পূর্ণ একাত্মতা। বস্তুবাদীকে মানতেই হবে,—

'অন্তর মিলালে তবে তার অন্তরের পরিচয়' পাওয়া যায়। জীবন-দর্শন ও কর্মে অভিন্ন হতে হবে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা এটা। যার প্রয়োগ দেখা গেছে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনে। তিনি কর্ম ও অধ্যয়ন দ্বারা এ-জীবন লাভ করেছিলেন। সহজাত ছিল না। শ্রেণীচ্যুত হয়ে শ্রেণীহীন হয়েছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে বস্তুগত বাস্তবতার কখনো অপ্রতুলতা ছিল না। কিন্তু দীর্ঘ হাজার বছর ধরে রচিত হলেও সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার জন্য অপেক্ষা করতে হলো বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত। এই সময় আমরা একাধিক লেখক পেলাম যারা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতায় বিশ্বাসী। অন্ততঃ দুজনের ক্ষেত্রে এই বিশ্বাস ছিল স্বতঃউৎসারিত। এরা হলেন, গল্প ও উপন্যাসে সোমেন চন্দ এবং কাব্য ও নাটকে সুকান্ত ভট্টাচার্য। বাস্তববাদের প্রতি বিশ্বাস উভয়ের ক্ষেত্রে

আজন্ম লালিত সংস্কারের মতই মনে হয়। সীমাহীন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এঁদের মধ্যে কখনো বিচ্যুতি দেখা যায় নি। 'অগ্রজের অটল বিশ্বাস' নিয়ে এঁরা এঁদের আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। বস্তুবাদের প্রভাব এঁদের জীবনে ছিল কৈশোর থেকেই। জীবনের কোন সন্ধিক্ষণেই এঁদের বিচলিত হতে দেখা যায় নি।

বস্তুবাদী সাহিত্যের যে অবয়ব আমাদের কল্পনায় ছিল, বিমূর্ত চেতনা হয়তো বা, এঁদের কলমে তা বাস্তব রূপ পেল, সাহিত্যাবয়বে মূর্ত হয়ে উঠল। ঐকতান কবিতায় কবি নতুন প্রজন্মের কবির, সাধারণ মানুষের কবির জন্য অপেক্ষারত। বলেছেন,—

"কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।"

সে কবি,—কবিতায় সুকান্ত এবং গদ্য সাহিত্যে সোমেন। এঁরা উভয়েই কর্মে ও কাজে অভিন্ন। বস্তুবাদ এঁদের হৃদয়কে দ্রবীভূত করেছে, বুদ্ধিকে শাণিত করেছে। হৃদয় ও বুদ্ধির মিলনের ফলে বস্তুবাদী জীবন চর্চায় ও প্রয়োগে এঁরা ছিলেন সিদ্ধ। বস্তুবাদী তার আদর্শের স্বরূপ জানবে নির্ভুলভাবে এবং প্রয়োগে হবে একাগ্র-চিত্ত, দ্বিতীয় রহিত ও অকুতোভয়। লেনিনের ভাষায়, তারা হবে 'ভ্যানগার্ড' ও 'ক্রীম অফ দি সোসাইটি।' এঁরা উভয়ে ছিলেন তাই। প্রথম থেকেই এঁদের লেখা শিষ্টজনগ্রাহ্য হলো। একবারও উচ্চারিত হলো না একথা যে, এ সাহিত্য নয়—প্রচার। এঁরা তো শুধু ভঙ্গি দিয়ে চোখ ভোলাল না। সত্য মূল্য না দিয়ে সাহিত্যের খ্যাতি চুরির দায়ে অভিযুক্তও হতে হয়নি এঁদের। কেন না, এঁরা ছিলেন কৃষাণের আক্ষরিক অর্থে, শরিকজন। ফলে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় নি এঁদের সাহিত্যের পশরা। কেমন করে এই অসম্ভব সম্ভব করলেন, চল্লিশের দশকে দুই কিশোর, হয়তো সেটা স্পষ্ট হয়েছে। তথাপি, এঁদের জীবন চর্যার আরো কিছু পরিচয় প্রয়োজন।

বস্তুবাদের ব্যবহারিক প্রয়োগে সোমেনের বৈশিষ্ট্য কি এবং সার্থকতা কতটুকু? প্রথম এবং জরুরী প্রশ্ন এটাই। এখন যেটা বাঙলা দেশ তার ঢাকা জেলায় সোমেনের জন্ম। এই অঞ্চলটি অবিভক্ত বাঙলা দেশে পূর্ববঙ্গ বলে পরিচিত ছিল। ১৯২০ সালে সোমেনের জন্ম। ১৯২০-তেই সোভিয়েত রাশিয়ার তাসখন্দে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়। যার সম্পাদক ছিলেন মহম্মদ শফিক। উদ্যোক্তা ছিলেন এম. এন. রায়। ঐ বছরই ভারতের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। সাম্যবাদীদের প্রভাবে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। সোমেনের শিক্ষা : ম্যাট্রিক পাশ। অর্থাভাবে তার পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ আর সম্ভব হয় নি। পরিবারের আর্থিক সামর্থ্য এতেই অনুমেয়। স্বাস্থ্য একেবারেই ভালো ছিল না। প্লুরিসির মত ভয়ঙ্কর অসুখও তার হয়েছিল। ভয়ঙ্কর এ-জন্যই যে সে সময় এ-রোগের প্রতিরোধক ভালো কোন ঔষধ ছিল না। ভালো ইংরেজী না-জানার জন্য সোমেনের মনে ছিল গভীর দুঃখ। পড়াশুনায় আগ্রহ ছিল সীমাহীন। ঢাকার যে পাড়ায় তিনি থাকতেন তার নাম ছিল মৈশণ্ডি। সেখানে সোমেন গড়ে তোলেন "প্রগতি পাঠাগার।"

দ্বিতীয় যে সাংগঠনিক প্রচেষ্টার সঙ্গে সোমেনকে আমরা এরপর যুক্ত হতে দেখি তার নাম "ঢাকা প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ"। "কমিউনিস্ট পাঠচক্রেরও" সদস্য ছিলেন সোমেন। এই সময় সোমেনের জীবনে র‍্যালফ্ ফক্স বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। এই তরুণ ইংরেজ স্পেনের আন্তর্জাতিক বাহিনীতে যোগ দেন ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু ১৯৩৯ সালে। ১৯৩৯-এর ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের সভাপতি নির্বাচিত হওয়া ভারতীয় রাজনীতিতে এক তাৎপর্য মণ্ডিত ঘটনা। যুবশক্তির মধ্যে চলছে প্রচণ্ড আলোড়ন। সোমেনের মত সচেতন তরুণ এর বাইরে থাকতে পারেনা। সেও আলোড়িত। তবে অন্য কারণে। বিপ্লবের কথা নয় তার জন্য কাজ

করতে চাইছিল সোমেন। সোমেনের বয়স যখন ১৫ সেই ১৯৩৫-এ, ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধান চালু হয়।

এই সময় কমিউনিস্ট নেতারা হয় অন্তরীণ না হয় আত্মগোপন করে আছেন। সোমেন রেলওয়ে ইউনিয়নের কাজে যোগ দিলেন। এই ইউনিয়নের এলাকা একটু বড়ই ছিল। নারায়ণগঞ্জ থেকে ভৈরব রেল স্টেশন পর্যন্ত। সোমেন এই ইউনিয়নের সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তখন সোমেনের বয়স মাত্র কুড়ি। সমানে চলছে তার মৌলিক লেখার কাজ। ঢাকার এই কুড়ি বছরের তরুণের লেখা তখন কলকাতার কাগজেও প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯৪১-এ রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'সভ্যতার সংকট'। সুভাষচন্দ্র দেশ ত্যাগ করলেন। ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে। জার্মানী সোভিয়েত দেশ আক্রমণ করে। কমিউনিস্টদের পক্ষ থেকে জনযুদ্ধের জন্য সাহায্যের আহ্বান জানানো হয়। সোমেন নতুন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির হয়ে কাজ করতে থাকেন। ভারতের কোন কোন মহল এই ব্যাপারটি সুনজরে দেখে নি।

৪২-এর ৮ই মার্চ। ঢাকায় ফ্যাসী বিরোধী কর্মী সম্মেলন আহ্বান করা হয়। তারই সম্মেলন চলছিল। সোমেন ঐ সম্মেলনে যাচ্ছিলেন দুপুরে, অল্প কয়েকজন সঙ্গীসহ শোভাযাত্রা করে। যাত্রা পথে ঐ শোভাযাত্রা আক্রান্ত হয়। অনেকেই পালিয়ে যায়। সোমেন পালায় নি। তাঁকে একা পেয়ে, বিনা প্রতিরোধে, সশস্ত্র আক্রমণকারীরা নির্মমভাবে হত্যা করে। দলবদ্ধভাবে প্রকাশ্য রাজপথে সাহিত্যসেবী হত্যার ঘটনা সেই প্রথম! রবীন্দ্রনাথ এমন এক 'কবির বাণী-লাগি কান পেতে' ছিলেন যিনি হবেন "কর্মে ও কথায় সত্য"। সোমেন, সন্দেহ নেই, কর্মে সত্য ছিলেন। এবার তাঁর 'কথা' প্রসঙ্গে কিছু সাহিত্য-কথা বলা হবে।

প্রকৃতি কিংবা প্রেম অথবা ঐ জাতীয় কিছু, মূর্ত অথবা বিমূর্ত, বর্ণনাপ্রধান বিষয় হলে, লেখকের মধ্যে একটি প্রবল উচ্ছ্বাস প্রকাশ পায়। দেখা যায় বর্ণনার গতি কাহিনীকে চালিয়ে চলছে। এটা

উচ্ছ্বাস এবং প্রগলভতাও আনে। তরুণ লেখকদের ক্ষেত্রে বর্ণনার উচ্ছ্বাস-প্রাবল্য বিষয়কে আচ্ছাদিত করে দেয়। বস্তুবাদীর কাছে শিল্প-সাহিত্য হলো,—'মানবীয় আদান প্রদানের উপায়' (প্লেখানভ)। আদান-প্রদান হবে বিষয়ের। তা যদি উপলক্ষ্য হয়ে ভাষাটিই লক্ষ্য হয় তবে আদান প্রদানের কাজ অসম্পূর্ণ থাকে। সাহিত্যিকের উদ্দেশ্যও হয় ব্যর্থ।

সোমেন তারুণ্যেই বর্ণনার বাহুল্য পরিহার করতে পেরেছিলেন। শব্দ ব্যবহারে ছিল পরিমিতি বোধ। ছোটো গল্পের মধ্যে অনিবার্য হয়ে উঠে আকস্মিকতা। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, বাল্য প্রণয়ে নাকি অভিশাপ আছে। যদিও বাল্যেই ভালবাসা থাকে মোহমুক্ত। সোমেন 'শিশু তপন' গল্পে এই প্রসঙ্গটি উপহার দিয়েছেন। বর্ণনায় সংযম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

"অভ্রভেদী অচলায়তন, অস্ত সূর্যের রাঙা রশ্মি, লাল ও দেবদারু গাছ: ইহাদিগের দুইটি একান্ত অজ্ঞাত বালক-বালিকার ইতিহাসই আমি বলিব।" গল্পের প্রথম দিকে মনে হয়েছিল এ গল্প আর পাঁচজন প্রৌঢ়ের দ্বিতীয় বিবাহের গল্প। তা হয়নি। কৈশোর ভালবাসার একটি স্নিগ্ধ মধুর কাহিনী এটি।

বিষয় লেখকের মানস-প্রবণতার পরিচয় দেয়। বহণ করে লেখকের মৌলিকতার চিহ্ন। 'বনস্পতি' সোমেনের এমন একটি গল্প। আশ্চর্য বিষয়। অসাধারণ দক্ষতা এবং বস্তুবাদের স্পষ্ট ধারণা না থাকলে এরকম গল্প লেখা যায় না।

বনস্পতি গল্পের কেন্দ্রে আছে পীরপুর হাটের "একটা দৈত্যের মত প্রকাণ্ড গোলাকার গাছ।" এই বটগাছটির ছায়ায় প্রবহমান মানব-ইতিহাসের দু'শ বছরের কাহিনী একটি ছোট গল্পের পরিসরে বিবৃত করা হয়েছে। শুরুতে আছে সামন্তবাদী পীরপুর এবং তার সামন্ত প্রভু জমিদার নবকিশোর, তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী অরুন্ধতী ও তার প্রেমিক সতীন পুত্র সুরেন্দ্র কিশোর! ১৭৬৯ সালের বাঙলার মন্বন্তর, ১৮৫৭'র সিপাহী বিদ্রোহ, বুর্জোয়া ব্যবস্থার আবির্ভাব, নেতা সুরেন্দ্রনাথের

কথা, গান্ধীর কথা এবং সব শেষে সর্বহারার নেতা সতীন মিত্র ও তার ঘায়েল হওয়ার কাহিনী। মনেই হয় না এ গল্পের কোন অংশ আরোপিত কিংবা অসংলগ্ন। বনস্পতিটি নায়কের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে আছে দু'শ বছর ধরে। সতীনের ঘায়েল হওয়ার পর গল্পটিও শেষ হয়। তার বর্ণনা অর্থবহ এবং হৃদয় গ্রাহী। "বটগাছের মৃত্যু আরম্ভ হইয়াছে, এতদিন চোখে পড়ে নাই, কিন্তু আজ দেখিতে বড় ভয়ানক"। বটগাছ তো প্রতীকমাত্র, এ-মৃত্যু অতীতের, শোষকের, সামন্ততন্ত্রের এবং বুর্জোয়া ব্যবস্থার। "ইহার কয়েকদিন পরেই এক ভীষণ ঝড় আসিল, এমন ঝড় এ-অঞ্চলে ইদানীং আর হয় নাই। ঝড়ের ঝাপটা মৃতপ্রায় বটগাছের উপরেই লাগিয়াছিল। বটগাছটা ভাঙ্গিয়া পড়িল, যেন প্রকাণ্ড এক দৈত্য ধরাশায়ী হইল।" এ ঝড় এনেছিল সর্বহারার নেতা সতীন মিত্র। আর ধরাশায়ী হলো শোষণ-তন্ত্র। বটগাছের মতই তা ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে যাচ্ছিল।

বস্তুবাদ বিশ্বাস করে বস্তুর পরিবর্তন হয় কিন্তু লয় নেই। সোমেনের গল্পেও তার প্রতিধ্বনি। "দীর্ঘ দুই শ' বছর পরে বটগাছ অবশেষে মারা গেল। ইহার নীচে অনেক ইতিহাস রচিত হইয়াছে, কত দীর্ঘশ্বাস চাপা কান্নার শব্দ ইহার প্রতিটি পাতার নিঃশ্বাসের সঙ্গে জড়িত, ইহার নীচে কত লোক চাপা পড়িয়াছে, তারপর এক রক্তের গঙ্গা বহিয়া গেল, এখনও কত রক্তের বীজ ছড়াইয়া আছে, সেই বীজ হইতে একদিন অঙ্কুর দেখা দিবে, তারপর অনেক নতুন বৃক্ষ জন্ম লইবে, ইহাও আশা করা যায়।" প্রাক্-কুড়ির এক তরুণ যখন বস্তুবাদে আস্থা স্থাপন করে তখন এই আশাবাদে অনুপ্রাণিত হওয়া ছাড়া অন্য পথ থাকে না। যদিও ব্যক্তি জীবনে সে নিঃস্ব এবং প্লুরিসি রোগাক্রান্ত। এমন পরিণতি কল্পনায়, পরিকল্পনায় বিস্ময়কর। সোমেন তরুণ এ আর ভাবার দরকার নেই। সোমেন পরিণত, বুদ্ধিদীপ্ত, সাবলীল, গতিময় এবং প্রাণবন্ত।

সোমেনের শ্রেষ্ঠ গল্প যে 'ইঁদুর' তা আজ সোমেনের পাঠক মাত্রেই মেনে নিয়েছে। এ-গল্পেও সেই বটগাছের মতই একটা কেন্দ্র বিন্দু

আছে। তা একটা ইঁদুর। বনস্পতি গল্পের বটগাছ যদি হয় সামন্ত-তন্ত্রের প্রতীক তবে ইঁদুর গল্পের ইঁদুর হলো সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক। অবশেষে, অনেক ক্ষতি করার পর সেই ইঁদুরটা ধরা পড়ল। আর তাকে মারার জন্য যে সামাজিক প্রস্তুতি, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে তা হলো সাম্যবাদী প্রস্তুতি। গল্পটিতে বলা হয়েছে একটি নিম্নবিত্ত পরিবারের কাহিনী। অসহনীয় দারিদ্র্য সেই পরিবারটিকে ঘিরে ধরেছে। যেমন ছোটো ছোটো দেশগুলোকে ঘিরে ধরে সাম্রাজ্যবাদীরা। বনস্পতি গল্পে আছে একটি ধনী পরিবার। সামন্ত শ্রেণীর প্রতীক।

কাহিনীর গতি সোমেনকে প্রলুব্ধ করতে পারত না। তার মধ্যে ছিল তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল দৃষ্টি। আশাবাদী। সোমেন সর্বদাই কাহিনী নিয়ন্ত্রণ করেছে। প্রতীক ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত। রূপক ব্যবহারে এনেছিল নব ঐতিহ্য। বস্তুবাদী উপমা-রূপক সৃষ্টিতে সোমেনের অবদান অবশ্য স্বীকার্য।

নীরদ চৌধুরী বাঙালী জীবনে রমণী চরিত্রের বিবর্তনে কয়েকটি শব্দ অতি সার্থকভাবে ব্যবহার করেছিলেন। নারীর নিরাপত্তা, বিবর্তন ও মূল্যের সার্থক প্রতিফলন ছিল তার শব্দ ব্যবহারে। নারী, বাঙালী জীবনে কিছুকাল পূর্বেও ছিল 'মাগী'। সে কেমন করে কোন মন্ত্রবলে প্রথম 'মহিলা' ও পরে 'রমণী' হলো তিনি সে কাহিনী বলেছেন। এই 'মাগী' শব্দটা সোমেনও তার ইঁদুর গল্পে ব্যবহার করেছেন।

সুকুর বাবা সুকুর মাকে উত্তেজিত হয়ে বলছে,—"তুমি যাবে? এখান থেকে যাবে কিনা বলো? গেলি তুই আমার চোখের সামনে থেকে? শয়তান মাগী।" লক্ষণীয় যে 'মাগী' শব্দটি ব্যবহারের আগে 'তুমি' এই সম্বোধন পদটি 'তুই' হয়ে গেছে। শব্দের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করছে সোমেন এইভাবে—

—"কিছু পরে মা বাষ্পাচ্ছন্ন স্বরে ডাকলেন, সুকু! সুকু!!

ঠিক তখুনি উত্তর দিতে লজ্জা হলো, ভয় করলো, তবু আস্তে বললাম, "বলো"?

মা বললেন, 'দরজা খোল'।

ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে দিলাম, ভয় হল এই ভেবে যে, এবার অনেক বিচারের সম্মুখীন হতে হবে, যা শুনতে ভয় পাই ঠিক তারই সামনে এক বিচারপতি হয়ে সমস্ত উত্তেজনাকে শূন্যে বিসর্জন দিয়ে রায় দিতে হবে।

কিন্তু যা ভেবেছিলাম তা আর হলো না। মা ঘরের ভেতর ঢুকেই ঠাণ্ডা মেঝের ওপর আঁচলখানা পেতে শুয়ে পড়লেন। পাতলা পরিচ্ছন্ন শরীরখানি বেঁকে একখানা কাস্তের আকার ধারণ করলো। কেমন অসহায় দেখাল ওঁকে, ছোট বেলায় যাঁকে পৃথিবীর মত বিশাল ভেবেছি, তাঁকে এমনভাবে দেখে এখন কতো ক্ষীণজীবি ও অসহায় মনে হচ্ছে! যাকে বৃহত্তম ভেবেছি, সে এখন কত ক্ষুদ্র। সে এখনো শৈশব অতিক্রম করতে পারেনি বলে মনে হচ্ছে। আর আমি কত বৃহৎ, রক্তের চঞ্চলতায়, মাংসপেশীর দৃঢ়তায়, বিশস্ত পদক্ষেপে কত উজ্জ্বল ও বৃহৎ, ঐ হরিণের মত ভীরু ছোট দেহের রক্ত পান করে একদিন জীবন গ্রহণ করলেও আজ আমি কত শক্তিমান।"

স্নুকুর নীরব প্রতিবাদের সার্থক বর্ণনার সঙ্গে স্বচ্ছতোয়া, চঞ্চলা সদাবহতা নদীর তুলনা করা যায়। শীতল, স্বচ্ছ কিছুটা বা উজ্জ্বলও। একটি শব্দের অভিঘাত। দেহের সঙ্গে কাস্তের উপমাটি অবশ্য লক্ষনীয়।

সোমেন গল্প লেখক-রূপেই পরিচিত। যদিও সোমেন কবিতা এবং নাটকও লিখেছেন। তিনি সতেরো বছর বয়সে একখানি উপন্যাসও লিখেছিলেন। উপন্যাসটির নাম 'বন্যা'। ভাবের বাহন সাহিত্য। সাহিত্যের প্রভাবে মানস বিপ্লব ঘটে। কেননা, "ভাবকে নিজের করিয়া অপরের করার নাম সাহিত্য বা ললিত কলা"। বিপ্লবী যখন সাহিত্যিক হন তখন তিনি বিপ্লব ছাড়া আর কোন ভাব প্রকাশ করবেন? রাষ্ট্র-বিপ্লবের জন্য সাহিত্য সৃষ্টিই যথেষ্ট নয়। সমাজের প্রতিটি স্তরে কাজ করে বিপ্লব সম্ভব করে তুলতে হয়। সোমেন এই দ্বি-মুখী যুদ্ধে নিজেকে সামিল করেছিলেন। হয়ত

একারণে, তাঁর সর্বাত্মক প্রভাবের জন্য শত্রু শঙ্কিত হয়ে তাঁকে হত্যা করে। নির্মম সে কাহিনী। লাইট ব্রিগেডের মত সোমেন সামনে-পেছনে—ডান-বাম সব দিক থেকেই আক্রান্ত হয়েছিলেন। '৪২-এর ৮ই মার্চ, বস্তুবাদীদের কাছে যুগপৎ গৌরব এবং শোকের দিন। গৌরবের দিন কেন না সোমেন মৃত্যুভয়ে পালিয়ে যায় নি। শোকের দিন এই জন্যই যে, সোমেনের মত খাঁটি বস্তুবাদী সাহিত্যিক প্রতি দশকে জন্মায় না। প্রশ্ন একটাই ৮ই মার্চ কেন ২১শে ফেব্রুয়ারীর মত স্মরণীয় হলো না। সোমেন ও সুকান্তর অকাল প্রয়াণ না হলে বাংলা সাহিত্যে বস্তুবাদী ধারার বিকাশ হতো বর্ষার নদীর মতো দু-কূলপ্লাবী। এঁদেরি হাত ধরে উঠে আসত আরো অনেকে।

সোমেন ছিলেন দরিদ্র, রুগ্ন এবং ডিগ্রী হীন। কী ছিল তাঁর? কোন শক্তির বলে স্বল্প জীবনে দীর্ঘতম পথপরিক্রমায় তিনি সফল? বৃহতের, মহত্ত্বের প্রতিশ্রুতি ছিল তাঁর প্রতি পদক্ষেপে। তাঁর 'মরাল' যা তিনি রক্ষা করছেন মাতার নিষ্ঠায় তার তুলনা কোথায়! ঐ একটি জিনিসই তিনি হারাতে ভয় পেতেন। সরলানন্দ সেন লিখছেন—মৃত্যুর কিছু আগে সোমেন লিখেছিলেন তাঁকে,—"একটা কাজ ঠিক করে দিন, নয়ত MORAL ভেঙ্গে যাবে।" Moral ভেঙ্গে যায় নি। প্রতিশ্রুতির ঝড় বইয়ে বস্তুবাদী সাহিত্য জগতকে বিমূঢ় করে সোমেন অকালে চলে গেলেন। রেখে গেলেন মরাল। যা থাকলে সব থাকে। না থাকলে—জানা যায় না ঠিক কি নেই ব্যক্তির জীবনে। কর্ম ও কথায় অভিন্ন থাকতে পারার নামই মরাল ধরে রাখা।

কবি সুকান্ত

বস্তুবাদের গৌরব

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯। জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলো। শুরু হলো মহাযুদ্ধ। সুকান্ত তখন ১৩ বছরের কিশোর। মহাযুদ্ধের ঝড় দাপাদাপি করছে দেশ থেকে দেশান্তরে। সুকান্ত ভট্টাচার্যদের [১৯২৬—১৯৪৭] পরিবারেও একটা ঝড় বয়ে গেল। তাদের যৌথ পরিবারটি ভেঙ্গে গেল। সুকান্ত'র মনের ভাঙ্গা-গড়াও হচ্ছে দ্রুত। বন্ধু অরুণাচলকে লেখা চিঠি তার স্মৃতিবাহী। পূর্ব ইউরোপের ছোট ছোট দেশগুলি দ্রুত আত্মসমর্পণ করছে হিটলারের [হের এডলফ্ হিটলার ১৮৮৯—১৯৪৫] ঝটিকা বাহিনীর কাছে। জাপান চাইছে এশিয়ার দেশগুলি দখল করে নিতে। জাপানী বোমার ভয়ে কলিকাতাবাসী আতঙ্কিত।

আতঙ্কিত কলিকাতাবাসী প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলো। দৃঢ়পণে উচ্চারণ করছিল প্রতিরোধের শপথ। এরি আগে শুরু হয়েছিলো কংগ্রেসের ভারত ছাড়ো আন্দোলন। কমিউনিস্টরা শুরু করলো জনযুদ্ধের প্রচার। সুকান্ত লিখলেন,

"বন্ধু, তোমার ছাড় উদ্বেগ সুতীক্ষ্ণ কর চিত্ত,
বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত।"

বাংলা সাহিত্যে বস্তুবাদী কাব্য সৃজন, পরিপোষণ ও প্রচারে সুকান্তর অবদান বিস্ময়কর। বস্তুবাদী সাহিত্যিককে মার্কসবাদে বিশ্বাস রেখে কাজ করতে হবে। তাঁকে বুদ্ধি এবং হৃদয় দিয়ে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে, "মার্কসবাদ আপ্ত বাক্য নয়, কর্মেরই পথ নির্দেশক" তাকে সেই নির্দেশিকা মেনে কাজ করে যেতে হয়। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় পরিণত বয়সে এই শর্ত পালন করতে পেরেছিলেন। অপরপক্ষে এটা কৈশোর থেকেই পালন করতে পেরেছিলেন সোমেন চন্দ। মার্কসবাদে বিশ্বাস ও জীবন চর্চায় এবং তার বিরতিহীন প্রয়োগে সোমেনের একমাত্র সাহিত্যিক প্রতিদ্বন্দ্বী

সহযোগী সুকান্ত। বস্তুবাদের প্রয়োগ ও বিশ্বাসে কে জয়ী হবে? সোমেন না সুকান্ত? এর থেকেও উচ্চাঙ্গের গবেষণার বিষয় হতে পারে, "সোমেন—সুকান্তর জীবনে মার্কসবাদ প্রয়োগে বিচ্যুতির উদাহরণ।" এঁদের জীবন চর্চা ও পরিবেশের সামান্য তুলনা অবশ্যই আকর্ষণীয় হবে আশা করি।

উভয়ের জন্ম বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। যে দশকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। যে-দশকের মানুষ প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের উত্তাপে ঝলসে উঠেছিল। যে-দশক থেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অঙ্কুর বপণের কাজ চলছিল। এবং ঐ-দশক থেকেই সোভিয়েত শ্রমিকরাষ্ট্র রক্ষার জন্য বিশ্বের প্রতিটি দেশেই কোন-না-কোন যুবক প্রতিজ্ঞার অগ্নি-মশাল জ্বালিয়ে দিয়েছিল নিজ বুকে। সোমেনের জন্ম ১৯২০ সালে এবং সুকান্তর ১৯২৬ সালে। উভয়েই জন্মেই দেখেছিল তীব্র দারিদ্র্যের ভয়াল মুখব্যাদান। সোমেন-সুকান্ত দুজনেই ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। মাত্র ২২ বছর বয়সে ঘাতকের হাতে নিহত হন সোমেন। সুকান্ত মৃত্যুর সময়েও অগ্রজ থেকে এক বছরের ছোটই থেকে গেলেন। তাঁর মৃত্যু হয় ক্ষয় রোগে ২১ বছর বয়সে। এই দুই তরুণের অকাল প্রয়াণ বাংলা বস্তুবাদী সাহিত্য বিকাশে এক নিদারুণ আঘাত! এই ক্ষতির পূর্ণ মূল্যায়ন আজও হয় নি। কিশোর কবি কিংবা গল্পকার বলে এঁদের কিছু বাহবা দেওয়া হচ্ছে মাত্র। ঢাকা এবং কোলকাতা—বুড়ী গঙ্গা আর ভাগীরথী গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে এই দুই কিশোর বাংলার বস্তুবাদী সাহিত্য বিকাশের জন্য দিয়েছিলেন বিরোধীদের বিরুদ্ধে হুঙ্কার এবং সহযোদ্ধাকে এগিয়ে চলার প্রতিশ্রুতি। বস্তুবাদী সাহিত্যের প্রাঙ্গনে দেখা দিয়েছিল বিপুল প্রত্যাশা। উভয়েই দায়বদ্ধ ছিলেন সাম্যবাদী বিশ্বাসে এবং রাষ্ট্রগঠণে। আর ওঁদের সাহিত্য সেই কাজটাই তরান্বিত করবে বলে ওঁরা বিশ্বাসও করতেন।

সুকান্ত প্রসঙ্গে মনে পড়বে রুশ কবি মায়াকোভস্কিকে। ভ্লাদিমির মায়াকোভস্কি—[১৮৯৩-১৯৩২] মাত্র পনেরো বছর

বয়সে রুশ বলশেভিক দলের সদস্যপদ লাভ করেন। রুশ বিপ্লব প্রচেষ্টার সঙ্গে কবি নিজেকে পুরোপুরি যুক্ত করেছিলেন। একসময় তিনি বলেছেন, "সেটা ছিল বিক্ষোভ আর জমায়েতের যুগ। তাতে যোগ দিতাম। একটা বিরাট ব্যাপার।" তিনি ছিলেন আদর্শের প্রতি নিবেদিত প্রাণ এবং দলের কাছে বিপ্লবী কবির আদর্শ।

সুকান্ত ভারতীয় কমিউনিস্ট দলের সর্ব কনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন। চিঠিতে বৌদিকে লিখেছিলেন, 'কবির চেয়ে বড় কথা আমি কমিউনিস্ট, কমিউনিস্টদের কাজ কারবার সব জনতা নিয়েই।' সুকান্ত জনতার কবি। অধ্যাপক কবি জগদীশ ভট্টাচার্যের কথায়—'যে কবির বাণী শোনার জন্য কবিগুরু কান পেতে ছিলেন সুকান্ত সেই কবি।'

সুকান্ত ছিলেন দলের সব সময়ের কর্মী। দলের সদস্যপদ লাভ ছিল সোমেনের মত সুকান্তরও সর্বাধিক কাম্য ধন। তা তিনি পেয়েছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় ইচ্ছা ছিল জনতার কবি হওয়া। সুকান্ত চিঠিতে লিখেছেন, ..."জনতার কবি হতে চাই, জনতাকে বাদ দিলে আমার চলবে কি করে?" কমিউনিস্ট এবং জনতার একজন হতে পারাই ছিল কবির ধ্যান জ্ঞান। কোন প্রলোভনই তাঁকে এই উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। সুকান্ত আপোষও করেন নি। সুকান্ত যে-জনতার কবি হতে চেয়েছিলেন তাদের ছিল না খাদ্য-বস্ত্র-পানীয়, শিক্ষা-স্বাস্থ্য কিংবা বাসস্থান। এদের জন্য কবিতা রচনা করতে হলে ভাব এবং ভাষার প্রাঞ্জলতা অপরিহার্য। সুকান্ত বলেওছেন, "আমার কবিতা পড়ে পার্টির কর্মীরা যদি খুশি হয় তাহলেই আমি খুশি।"

কবিতায় সুকান্ত এনেছে নতুন প্রতীক, উপমা এবং চিত্রকল্প। বাঙালীর শ্রুতি ঐতিহ্যে স্থায়ী হয়েছে চাঁদের সঙ্গে প্রিয়ার উপমা। সেটা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন শ্রুতি ঐতিহ্য গড়ে তোলেন তিনি ঝলসানো রুটির সঙ্গে চাঁদের তুলনা করে। তা পাঠক গ্রাহ্য এবং আদৃতও হয়। "রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল" বলে সুকান্তর আহ্বানে অপ্রত্যাশিত সাড়া পাওয়া যায়।

বিপ্লবী চিত্রকল্পের আদল ফুটে উঠে বাংলা ভাষায় বস্তুবাদী কবিতার পরিমণ্ডলে।

ছন্দ ব্যবহারেও সুকান্ত পর্যাপ্ত মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন। বাংলা কবিতায় প্রচলিত তিনটি ছন্দই,– তান প্রধান, ধ্বনি প্রধান ও ছড়ার ছন্দ তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে। 'লেনিন' কিংবা 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় তিনি যে ছন্দ ব্যবহার করেছেন, কাহিনী কবিতা 'ঠিকানা' কিংবা 'রানার' কবিতায় তা করেন নি। ছড়া জাতীয় কবিতাও তিনি লিখেছেন।

১৯৪৬-এ আই. এন এ. খ্যাত আবদুর রশীদের দণ্ডাজ্ঞা বাতিলের দাবীতে কলকাতায় যে আন্দোলন হয় সুকান্ত তার শরিক।

ছাত্র সুকান্তর স্মরণীয় কৃতিত্ব 'ঠিকানা' কবিতাটি রচনা। এটি তিনি ১৯৪৫-এর চট্টগ্রাম প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে এক ছাত্রের প্রশ্নের উত্তরে লেখেন। ছাত্রটি সুকান্তর ঠিকানা জানতে চেয়েছিল। ১৯৪৫-এর সেই টালমাটাল দিনের কথা আজ স্মৃতি মাত্র। কিন্তু সুকান্তর কবিতায় তা চির ভাস্বর,

"বন্ধু, কুয়াশা, সাবধান এই
সূর্যোদয়ের ভোরে ;
পথ হারিও না আলোর আশায়
তুমি একা ভুল ক'রে।"

সামাজিক অসঙ্গতি কিংবা প্রথা অনুবর্তন করা নিয়ে পরিহাস রসিকের পরিচয় পাই সুকান্তর মধ্যে। 'মেয়েদের পদবী' কবিতায়, তিনি বলেন,—

'মেয়েদের পদবীতে গোলমাল ভারী,
অনেকের নামে তাই দেখি বাড়াবাড়ি,
* * *
গুপ্ত গুপ্তা হয় মেয়েদের নামে,
দেখেছি অনেক চিঠি, পোস্টকার্ড খামে।'
* * *

নাগ যদি নাগা হয় সেন হয় সেনা
বড়ই কঠিন হবে মেয়েদের চেনা।'

সুকান্ত কিশোর। সুকান্ত ছাত্র। সুকান্ত যোগ দিলেন ছাত্র আন্দোলনে। চল্লিশের দশকের গোড়া থেকে প্রতিটি আন্দোলনের সঙ্গে সুকান্ত যুক্ত। প্রতিটি মিছিলের পুরোভাগে কবি সুকান্ত। ১৯৪৪-এ আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনা মুক্তির দাবীতে দুর্বার ছাত্র মিছিলের প্রথম যাত্রী সুকান্ত। আবার '৪৬-এর ভিয়েতনাম মুক্তি দিবসের উচ্ছল ছাত্র অভিযানের নেতাও তিনি। '৪৬-এর প্রাণবন্ত তরুণ, দুরন্ত সুকান্ত লেখেন,—

'আঠারো বছর বয়সের নাই ভয়।' ৪৬-এর কলিকাতা। দাঙ্গার কলিকাতা। সুকান্তর মৃত্যুর অন্যতম কারণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কেননা, ঐ সময় উত্তর কলকাতার সঙ্গে যাদবপুরের যোগাযোগ রক্ষা খুব কষ্টসাধ্য ছিল। এ-কারণেই সুকান্তর চিকিৎসায় কিছু বিভ্রাট ঘটে। সুকান্ত রোগশয্যা থেকেই সে-কলকাতার ছবি রেখে গেছেন তার সেপ্টেম্বর '৪৬ কবিতায়।

সুকান্তর কাব্য জীবন বছর ছ'সাতের। '৪০-এ তার শুরু। ১৯৪১-২২শে জুন সোভিয়েত দেশ আক্রান্ত হয় ফ্যাসিস্ট জার্মানীর দ্বারা। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত হলো সোভিয়েত সুহৃদ সংঘ। ১৯৪২-এ প্রতিষ্ঠিত হলো ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ। তখন এসেছে মুক্তি যুদ্ধে সাহায্যের ডাক। সুকান্ত সেই মুক্তি যুদ্ধের অপ্রতিরোধ্য সাম্যবাদী কবি। সুকান্ত লিখছেন,—

"পালাবে বন্ধু? পিছনে তোমার ধূমন্ত ঝড়
পথ নির্জন, রাত্রি বিছানো অন্ধকারে।
চলো, আরো দূরে?"

'রাত্রি বিছানো' এবং 'ধূমন্ত ঝড়' শব্দযুগল আমাদের অবশ্যই দৃষ্টি এবং শ্রুতিকে টানে। এই পর্যায়ে সুকান্তর চিন্তা-চেতনা ছিল আন্তর্জাতিকতা রোধে অনুপ্রাণিত। লেনিন তাকে বিপ্লবে দীক্ষা দেয়। একলব্য'র মতই দূরতম শিষ্য যেন। সুকান্ত প্রতিরোধী এবং

প্রতিবাদী। তাই বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ প্রতিবাদী চরিত্র তার কাব্যে বার বার ফুটে উঠে।

'যেখানে মুক্তির যুদ্ধ সেখানেই
কমরেড লেনিন'

এবং ফ্যাসিস্ট শক্তির নিশ্চিত অবসান সে দেখতে পায়। 'ইতিহাস মোড় ফেরে পদতলে বিধ্বস্ত বার্লিন'।

১৯৪৩ সাল। বাংলার ১৩৫০! দুঃস্বপ্নের স্মৃতিবাহী ১৩৫০। মনুষ্য সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের মর্মান্তিক স্মৃতির বিষাদসিন্ধু এই ১৩৫০ বঙ্গাব্দ। সৈন্যবাহিনীতে লোক নিয়োগ এবং খাদ্য সরবরাহ সুনিশ্চিত করবার জন্যই এই দুর্ভিক্ষের প্রয়োজন হয়েছিল।

রাজনৈতিক প্রয়োজনে, সাম্রাজ্যের স্বার্থে এবং প্রশাসনের মদতে এই দুর্ভিক্ষ সফল করা হয়। পঞ্চাশের দলিল গণনাট্য সংঘের গান। 'সোনার বাংলা হলো শ্মশান, একসাথে সব চল। একসঙ্গে চলার জন্য বেলেঘাটায় গড়ে তোলা হলো 'জনরক্ষা সমিতি।' 'দুয়ারে কান্না' সন্তানেরা, 'মা মাগো একটু ফ্যান' বলে আর্তনাদ করে। কিশোর সুকান্ত ভ্রাতা-ভগ্নীর অশ্রু মোচনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ক্ষুধার্তের সাহায্যে। জনরক্ষা সমিতির সে সর্বক্ষণের কর্মী। শুধু সেবা নয় লাইনে চাল দিচ্ছে, চিনি এলে চিনি কিংবা কেরোসিন বিতরণ করছেন। সুকান্ত আবার রাঁধা খাবারও দিচ্ছেন দুস্থ মানুষের পংতি ভোজের আসরে। সুকান্ত যে কবি। জনতার কবি। তাদের দুঃখের কথা, অপমানের কথা, প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধের কথা সুকান্ত না-বললে কে বলবে? সুকান্ত লিখলেন 'এই নবান্নে' আর 'বোধনের' মত কবিতা।

……'গত হেমন্তে মরে গেছে ভাই, ছেড়ে গেছে বোন,
পথে-প্রান্তরে খামারে মরেছে যত পরিজন,
নিজের হাতের জমি ধান-বোনা
বৃথাই ধুলোতে ছড়িয়েছে সোনা,
কারোরই ঘরেতে ধান তোলবার আসেনি শুভক্ষণ
তোমার আমার ক্ষেত ফসলের অতি ঘনিষ্ঠ জন।'

মরে গেছে ভাই, না বলে বোন বললে এবং ছেড়ে গেছে বোন, না বলে ভাই বললে দুর্ভিক্ষের জ্বালা, অসহায় মানুষের আর্তনাদ কী এমন নিষ্ঠুর ভাবে ফুটে উঠত! সুকান্ত প্রত্যাশার কবি। প্রতিশ্রুতির কবি। "আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়' তাই তার শেষ কথা হতে পারে না। বিশ্বাসের জোরাল বাতাস যে জনমনে বইয়ে দিতেই হবে। 'এই নবান্নে' কবিতা তাই শেষ হয় নতুনের উপস্থিতিতে—নব-নবান্নে।

'এবার নতুন জোরালো বাতাসে
জয়যাত্রার ধ্বনি ভেসে আসে,
পিছে মৃত্যুর ক্ষতির নির্বচন—
এই হেমন্তে ফসলেরা বলে : কোথায় আপন জন' ?

সুকান্ত প্রতিবাদী, সুকান্ত যুবক। যুবকেরা স্বপ্ন দেখে। সুকান্ত স্বপ্ন দেখতেন। সাম্যবাদের স্বপ্ন। সেকারণেই তাঁর মনে হতো,—"বিপ্লব স্পন্দিত বুকে মনে হয় আমিই লেনিন,"—বিপ্লবের স্বপ্নে মশগুল সুকান্ত বাস্তব জীবন থেকে কখনো দূরে সরে যায়নি। এদেশকে তিনি ভালোবাসেন। ভালোবাসার ধনের কিছু অজানা থাকে না। ভারতবর্ষের বাস্তব অবস্থা স্মরণে তাই কবির মথিত হৃদয়ের ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে সঙ্গত কারণেই,—

'এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম'।

যুদ্ধ, বন্যা এবং ঝড়। ভারতবর্ষ তখন ঝড়ে পড়া জাহাজের মত টালমাটাল অবস্থায়। ১৯৪৬-বোম্বাইতে নৌ বিদ্রোহ এবং সারা-ভারত ডাক—তার বিভাগে চলছে কর্মবিরতি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতাও আসন্ন। কিন্তু তারও আগে ১৯৪২ থেকেই যে গণ-বিক্ষোভ চলছিল সুকান্ত সেই দ্রুত পরিবর্তনশীল যুগসন্ধির কবি। কী বিস্ময়কর দ্রুত বহমান সেই জীবন। গণনাট্য সংঘের জন্য প্রচার নাটক এবং কবিতা লিখছেন তরুণ সুকান্ত। রাস্তায় রাস্তায় বিক্রি করছেন 'জনযুদ্ধ'। ফ্যাসিস্ট বিরোধী পোস্টার লিখছেন আর দেয়ালে দেয়ালে রাতের অন্ধকারে তা আঁটছেন। নারকেলডাঙ্গার জুট মিলে শ্রমিকদের মধ্যে

ট্রেড ইউনিয়ন এবং ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষে 'আকাল' সম্পাদনা করছেন। সঙ্গে সঙ্গে চলছে তাঁর কাব্য চর্চা।

"এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ ;
দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ ;"

সাম্যবাদীদের দেশপ্রীতি প্রসঙ্গে যে-কটাক্ষ তখন একটি মহল থেকে উচ্চারিত হচ্ছিল তার প্রতিবাদে সুকান্ত লিখলেন—

"আমরা চেয়েছি স্বাধীন স্বদেশভূমি"। সমসাময়িক প্রতিটি ঘটনা তাঁকে ভাবিয়েছে এবং তাঁর প্রতিক্রিয়া কবিতায় ধরা আছে। সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপের প্রতি,—

'তোমাদের দেশে মে মাস
এখানে ঝোড়ো বৈশাখ।'

ভেজাল নিয়ে বিচলিত সুকান্ত লিখলেন,—

"ভেজাল, ভেজাল, ভেজাল ভাই
ভেজাল সারা দেশটায়।"

মন্বন্তর প্রসঙ্গে তাঁর প্রতিক্রিয়া—

"আজ আমার পুরানো কাস্তে পুড়ে গেছে ক্ষুধার আগুনে"। সুকান্ত আশাবাদী। একজন খাঁটি বস্তুবাদীর মত ভবিষ্যতের প্রতি তাঁর অবিচল বিশ্বাস। ভবিষ্যতের কথা ভেবেই তিনি গড়ে তুলে ছিলেন 'কিশোর বাহিনী।' সংগঠক সুকান্তর কালজয়ী কীর্তি এই কিশোর বাহিনী গঠন। অনেকেই নিশ্চয় সহযোগিতা করেছিলেন। কিন্তু বাঙলা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কিশোর বাহিনীর তিনশ শাখা গড়ে তোলা এক অনন্য কীর্তির পরিচয়। তখনকার স্বাধীনতা পত্রিকায় কিশোর সভার সম্পাদক ছিলেন সুকান্ত।

'মার্কসবাদ কর্মেরই পথ নির্দেশক' কথাটা সুকান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ ও প্রয়োগ করেছেন তাঁর জীবনে। তত্ত্বের ভাবরূপের প্রকাশ হয়েছে কবিতায়। সুকান্তর কর্মকাণ্ডের সার্থকতা কতটুকু? কবি বুদ্ধদেব বসু সুকান্তকে পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন "রাজনৈতিক পদ্য লিখে শক্তির অপচয় করছ তুমি, তোমার জন্য দুঃখ হয়।"

সুকান্তর মৃত্যুর পর তিনি লিখেছিলেন,—'তার কিশোর হৃদয়ের স্বাভাবিক উন্মুখতার সঙ্গে পদে পদে দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়েছে একটি কঠিন, সংকীর্ণ তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মতবাদ।" কোন মন্তব্য করব না, কেবল কয়েকটি শব্দের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। সুকান্ত 'পদ্য' লিখেছেন এবং বস্তুবাদ 'কঠিন', 'সংকীর্ণ' ও "তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মতবাদ"। মতবাদটি যে কঠিন এতে কোন সন্দেহ নেই।

মহাকবি শেক্সপীয়রের নাটক দেখে এক কিশোর পুত্র নাকি তার পিতাকে বলেছিলো, নাটকটা মন্দ নয় কিন্তু কবি বড্ড প্রবাদ ব্যবহার করেছেন। কবির লেখাই যে প্রবাদে পরিণত হয়েছে, এটা ঐ কিশোর জানত না। প্রবাদ হলো, বহু ব্যবহৃত এবং অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ সমাজগ্রাহ্য সেই সংহত বাক্য বা বাক্যাংশ, যার মধ্যে ধরা আছে একটি গল্প, কাহিনী কিংবা উপকথা বা ঐতিহাসিক কাহিনীর সার। দীর্ঘদিনের ব্যবহারেই এই সংহত বাক্যটি গড়ে উঠেছে। লোক সম্মতিতে তা স্থায়ী হয়েছে। কোন লেখকের একটি বাক্য যখন প্রবাদ রূপে গ্রাহ্য হয় তখন বুঝতে হবে সামাজিকের মনের কথা তিনি সার্থকভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন। লেখক মাত্রেই এটা কামনা করেন। এ হলো সাহিত্যের সমাজগ্রাহ্য হওয়ার স্বীকৃতি। ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রেও এটা আমরা হতে দেখেছি। সময় এ স্বীকৃতি দিয়েছে।

সুকান্তর ক্ষেত্রে এটা, এই প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে অতি দ্রুত। 'বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি', এমনি একটি প্রবাদ। প্রবাদ বা প্রবাদ প্রতিমতায় থাকে সর্বজনীনতা, ভাবের ঘনবদ্ধতা এবং বচনাতীত অর্থদ্যোতনা। এ-ছাড়াও চাই অনুষঙ্গ, সারল্য এবং ভাবোদ্দীপক বিষয়। আশ্চর্য, তরুণ সুকান্ত এতগুলি শর্ত পালন করেছিলেন। তাঁর 'পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি' বাক্যটিও আজ প্রবাদে পরিণত হয়েছে। 'ঠিকানা আমার চেয়েছ বন্ধু' বাক্যটি প্রবাদ প্রতিমতা লাভ করেছে। আরো কয়েকটি প্রবাদ এবং প্ররাদ প্রতিম বাক্য

হলো, 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী-গদ্যময়', 'এ-দেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম', 'আঠারো বছর বয়সের নাই ভয়' এবং 'স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই।"

একেবারে আটপৌর শব্দে, সাবলীল ছন্দে সুকান্ত কবিতা লিখতেন। সুকান্ত তাই কবিতায় মূলতঃ ব্যবহার করেছেন মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। পয়ারের প্রবহমানতা তার কবিতায় ভাবের সহায়ক হয়েছে। সময় প্রতিবিম্বিত করা তাঁর আর একটি বৈশিষ্ট্য। তিনি সময়ের আগে কিংবা পরে জন্মাননি। তাঁর যখন দরকার তখনি তিনি এসেছেন। বলা হয় সুকান্ত যান্ত্রিক মতবাদে নিমগ্ন। আসলে তো তিনি ছিলেন প্রতিবাদে মগ্ন। হৃদয়ের প্রসারতা মতবাদের দ্বারা সঙ্কুচিত হয়নি। তাই তিনি একই সঙ্গে বিস্ময়কর শ্রদ্ধায় কবিতা রচনা করতে পারেন, লেনিন, রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীকে নিয়ে।

সাম্যবাদ তাকে আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী করেছিল। সেকারণেই আন্তর্জাতিকতাবাদী সুকান্ত লেখেন লেনিনকে নিয়ে, ভারতের পটভূমিকায় গান্ধী তাঁর শ্রদ্ধেয় এবং সর্বমানবের অন্তরলোকের শ্রেয় সত্যের সন্ধানে আশ্রয় নেন রবীন্দ্রনাথের চরণতলে। 'লেনিন' কবিতায় এই আন্তর্জাতিক চেতনা ও বিপ্লব মাখামাখি হয়ে আছে।

> "আশ্চর্য উদ্দাম বেগে বিপ্লবের প্রত্যেক আকাশে
> লেনিনের সূর্যদীপ্তি রক্তের তরঙ্গে ভেসে আসে ;
> ইতালী, জার্মান, জাপ, ইংলণ্ড, আমেরিকা, চীন,
> যেখানে মুক্তির যুদ্ধ সেখানেই কমরেড লেনিন।"

সুকান্ত সাম্যবাদী। মহাত্মা গান্ধী ভাববাদী। তবুও মহাত্মা এবং ভারতবাসী এ-দুটি শব্দ বিযুক্ত হয় নি সুকান্ত'র কাছে। সুকান্ত বাস্তববাদী। কবিতায় তিনি এই বাস্তবতা ছুঁয়ে থেকেছেন। তাঁর কবিতা তাই জনতার কবিতা হতে পেরেছে। সুকান্ত তো জনতার কবিই হতে চেয়েছিলেন।

'মহাত্মাজীর প্রতি' কবিতায় মহাত্মা চিত্র :—

"চল্লিশ কোটি জনতার জানি আমিও যে একজন,
হঠাৎ ঘোষণা শুনেছি : আমার জীবনে শুভক্ষণ
এসেছে, তখনি মুছে গেছে ভীরু চিন্তার হিজিবিজি।
রক্তে বেজেছে উৎসব, আজ হাত ধরো গান্ধীজী।

* * *

"তাইতো এখানে আজ ঘনিষ্ঠ স্বপ্নের কাছাকাছি,
মনে হয় শুধু তোমারই মধ্যে আমরা যে বেঁচে আছি—"

রবীন্দ্রনাথের মতই সুকান্ত কবিতায় কখনো মিথ্যাচার করেন নি।

সুকান্ত সংগ্রামের কবি। সংগ্রাম সুকান্তর কবিতা। সুকান্ত বর্তমানের কবি। সুকান্ত ভবিষ্যতের কবি। ভবিষ্যতের প্রতি অবিচল বিশ্বাস তাঁর দৃঢ় হয়েছে রবীন্দ্র-চর্চায়। রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে সুকান্ত তিনটি কবিতা লিখেছেন। এদেশে জন্মে কবি পদাঘাতই পেয়েছেন। কিন্তু মানুষে বিশ্বাস হারাননি। এই বোধ রবীন্দ্র দীক্ষা থেকে। রবীন্দ্র প্রসঙ্গে কবিতাগুচ্ছ ভাষায়, ভাবে এবং বাক্যগঠনরীতিতে 'লেনিন' কিংবা 'মহাত্মাজীর প্রতি' কবিতা থেকে একেবারে আলাদা। আবার এই তিনটি কবিতাও পরস্পর সমগোত্রীয় নয়। কবি রবীন্দ্রনাথকে কবি সুকান্ত ত্রি-মাত্রিকভাবে দেখছেন যেন।

রবীন্দ্রনাথ নেই। শ্রাবণ দিন। সুকান্ত লিখছেন,—

'তোমার সন্ধ্যার ছায়াখানি
কোন পথ হতে মোরে
কোন পথে নিয়ে যাবে টানি'

অমর্ত্যের আলোক সন্ধানী
আমি নাহি জানি।

একদা শ্রাবণ দিনে গভীর চরণে,
নীরবে নিষ্ঠুর সরণিতে
পাদস্পর্শ দিতে
ভিক্ষুক মরণে
পেয়েছ পথের মধ্যে দিয়েছ অক্ষয়
তব দান,
হে বিরাট প্রাণ।
তোমার চরণ স্পর্শে রোমাঞ্চিত পৃথিবীর ধূলি
উঠিছে আকুলি',

এ-কবিতায় আছে বিরাটের প্রতি আত্মসমর্পণের কথা। আশ্রয় কামনা। 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণার উৎসরূপে দেখা হয়েছে। ভাব এবং ভঙ্গীও আলাদা।

"এখনো আমার মনে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি,
প্রত্যেক নিভৃত ক্ষণে মত্ততা ছড়ায় যথারীতি,"

চাওয়া পাওয়ার মধ্যে একটা যেন ফাঁক থেকে গেল। জীবন এবং উদ্দেশ্যর মধ্যে সমন্বয়ের তাগিদে লেখা পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশে কবিতায়,—

"আমার প্রার্থনা শোনো পঁচিশে বৈশাখ,
আর একবার তুমি জন্ম দাও রবীন্দ্রনাথের।"

এই যে উদার মন, এ-মন কবির এ মন বিপ্লবীরও। সংগঠকেরও থাকতে হবে এই মন। এ-মনের অধিকারী মানুষের অতি ঘনিষ্ঠ জন। স্মরণীয় এই প্রসঙ্গে, কমরেড লেনিন হেগেলকে অবশ্য পাঠ্য বলে মনে করতেন। তাঁর কথা মানার জন্য নয়। তাঁর যুক্তিগুলো জানার জন্য।

কিন্তু প্রবীণেরা এ ভাবে বলেন না। এতকাল তাঁরা যা বলেছেন সে সব অন্যরকম কথা। কবিতা লেখার প্রথম দিন থেকেই, যদি প্রথম দিনের কোন শ্রুতি স্মৃতিবাহী হয়ে একালে এসে থাকে, কবিতা মাতার প্রসব বেদনা ও সন্তানকে ধ্যানের ধন বলে থাকেন।

কবি-মাতা কবিতার জন্মদানানন্দকে স্বর্গীয় উপলব্ধির সমার্থক বলে মনে করেন।

বস্তুবাদী কবিরা এরকম প্রসবকালীন পরা অভিজ্ঞতা থেকে মুক্ত। এরকম কিছু তাদের হতেই পারেনা। বস্তুবাদী কবির কাছে কবিতা সৃষ্টি একটা সচেতন প্রয়াস। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যন্ত্রণার মুখোমুখি হওয়া, অপেক্ষা এবং সৃষ্টি এই স্তরগুলি বস্তুবাদী কবিকেও অতিক্রম করতে হয়। যদিও তা কোন পরা অভিজ্ঞতা নয়। বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাস এবং সংগ্রামের অভিজ্ঞতাই তার কবিতার উৎস। যতদিন শ্রেণী বিভক্ত সমাজ থাকবে ততদিন বস্তুবাদী কবির কবিতা মানব শিশুর মতই জন্মমুহূর্ত থেকে আর্তনাদ করবে। প্রতিবাদের আর্তনাদ। প্রবহমান জীবনের কথা, চলমান মানুষের কথা, অন্যায়ের প্রতিবাদ এবং ভবিষ্যতের বিজয় ঘোষণাই বস্তুবাদী কবির কবিতায় থাকবে। তার অভিজ্ঞতা প্রকাশে চিত্রকল্প-উপমা-উৎপ্রেক্ষা কিংবা রূপক থাকবে। যেহেতু তা কবিতা, প্রবন্ধ নয়। অবশ্যই বাসনালোকের বিগলন ঘটাবে বিপ্লবের কবিতাও। কেননা, বস্তুবাদী কবিও তার ভাবকে অপরের করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটা যদি না হতো সুকান্তর কবিতায়, তাহলে তাঁর কবিতার চরণ প্রবাদ বা প্রবাদ প্রতিমতার জনপ্রিয়তা পেতই না।

প্রতিবাদী কবির স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায় তার বিষয় নির্বাচনে। বস্তুবাদীর ক্ষেত্রেও এটাই ঘটে। কেন না, ভাববাদী বিশ্বকে যেমন দেখে বস্তুবাদীরা যে তার ঠিক উল্টো দিক থেকে দুনিয়াটা দেখে। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত'র কাব্য প্রসঙ্গে এটা উল্লিখিত হয়েছে। সুকান্তও তাই করেছেন। বিষয় নির্বাচনে সুকান্ত চমৎকার মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন 'একটি মোরগের কাহিনী', 'সিঁড়ি', 'কলম', 'সিগারেট' এবং 'দেশলাই কাঠি' তাঁর কবিতার বিষয়। আর এরা সকলেই বিদ্রোহ করছে এতদিন ঘটে যাওয়া উপেক্ষা, অবহেলা আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে। অচেতনে চেতনার সঞ্চার কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুকান্ত তাতে একশ'ভাগ সফল।

সুকান্ত বেঁচে থাকলে কী হত তার আলোচনা 'বিলাসের ফাঁস' হবে। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন বস্তুবাদী কবির শর্ত পালন করেই বেঁচে ছিলেন। তার কবিতা বস্তুবাদী কবিতার চমৎকার উদাহরণ। যা কিছু সমকালে সবচাইতে ভালো, তা ভবিষ্যতে আরো ভালো করাই মানব প্রগতি এবং সাধনা। সুকান্ত তার সময়ের সেরা বস্তুবাদী কবি। কর্মে ও কাজে তাকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে নি এখনও কেউ। তাই, বাংলা সাহিত্যে সুকান্ত আজও প্রধান বস্তুবাদী কবি।

সুকান্তর কবিতা নিয়ে ভাববাদীদের দ্বিধা থাকবেই। তবুও সুকান্ত কবি এবং বাংলা সাহিত্যে তৃতীয় জনপ্রিয় কবি। রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলকে বাদ দিলে কবি হিসেবে এত জনপ্রিয় কবি বাংলা কবিতা ক্ষেত্রে আর কেউ নয়। বাঙলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিদ্যালয়ের একাধিক ছাত্র সুকান্তর কবিতা মুখস্থ বলতে পারবে। পারবেই। এ-সৌভাগ্য খুব কম কবির ভাগ্যে ঘটে। সার্থক কবিতা না লিখে এ-জনপ্রিয়তা পাওয়া যায় না। আঁতের কথা না বললে এভাবে কেউ মনেও রাখে না। সুকান্তর অকাল মৃত্যুতে বাংলা বস্তুবাদী কবিতার ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, তা আর কেউ ভরিয়ে দিতে পারে নি। বস্তুবাদী কবিতাকে তিনি এতটাই এগিয়ে দিয়েছিলেন আঙ্গিক ও দর্শনে, সেই জায়গায় আর কেউ পৌঁছতেই পারলেন না!

সোমেনের সঙ্গে সুকান্তর অনেক মিল আমরা লক্ষ্য করেছি। সব চাইতে বড় মিল হলো, উভয়ের মধ্যে যৌবনের তেজ আর পরিণত বুদ্ধির সমন্বয় হয়েছিল। ফলে, গদ্যে সোমেন এবং কবিতায় সুকান্ত এক তেজী কিন্তু পরিণত সাহিত্য সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। এই তেজটা, যৌবনের উন্মাদনা বস্তুবাদী সাহিত্যের প্রাণ। এর পর যারা কবিতা রচনা করেছেন বা করছেন তাঁদের অনেকেই পণ্ডিত এবং তাঁদের সাহিত্যে তার প্রতিফলনও হয়েছে। কিন্তু অভাব যেটা তা হলো, বস্তুবাদী তেজ আর দৃপ্ত পদচারণা এবং যৌবন। যে বয়সে বলা যায়,—

"আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ
স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি,
আঠারো বছর বয়সেই অহরহ
বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি।"

বাংলা বস্তুবাদী সাহিত্যে এই আঠারোর পরেই ৫৮তে এসে গেছে। মাঝে একটা ২৮ বিকল্পে ৩৮ থাকা প্রয়োজন ছিল। পুস্তকের ভূমিকায় প্রশ্ন ছিল গণনাট্যের প্রভাব কী মুছে গেল। না মুছে যায় নি। সোমেন—সুকান্তর অকাল প্রয়াণে প্রজন্মের শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। তাই তা আর চেনা লাগে না। এঁরা বেঁচে থাকলে কী হতো জানি না। মধ্যবর্তী প্রজন্মের অভাব থাকত না নিশ্চয়। বাংলা বস্তুবাদী সাহিত্য তার ধারাবাহিকতা হারাত না। এঁরাই আটত্রিশে অন্য রকম কিছু লিখতেন। অনেকেই বস্তুবাদী সাহিত্যিক রূপে বাংলা সাহিত্যে এসেছেন। কিন্তু কঠিন জীবনচর্চা ধরে রাখতে পারেন নি। প্রলোভন কিংবা দৃঢ়তার অভাবে। যে দু'জন পেরেছিলেন তাদের মৃত্যু ছিনিয়ে নিল। বস্তুবাদী সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ ক্ষতির প্রতিকার আজও হয় নি। তাই হয়তো আজ সব অচেনা লাগে। সঞ্চারীটি হারিয়ে গেছে। অতীতের সঙ্গে বর্তমানকে তাই যোগসূত্রহীন মনে হয়।

সমাপ্ত

নির্ঘণ্ট

গ্রন্থপঞ্জী

১. বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ—রাহুল সাংকৃত্যায়ন — অনুবাদ কমলেশ সেন

২. মানব সমাজ (১ম খণ্ড) ঐ — " সুবোধ চৌধুরী

৩. ধর্ম ও সমাজ — জর্জ টমসন

৪. বানর থেকে মানুষের বিবর্তনে শ্রমের ভূমিকা — ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

৫. দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ — জে. ভি. স্তালিন

৬. মার্কসবাদ ও সাহিত্য — ই. এম. এস নাম্বুদিরিপাদ

৭. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১-২) ও বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত — ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৮. দেশ (সাপ্তাহিক) — ২২. ১২. ৮৬ সংখ্যা

৯. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ জিজ্ঞাসা—ডঃ নিতাই বসু

১০. তারাশঙ্করের শিল্পীমানস — ঐ

১১. জীবন শিল্পী সুকান্ত — অমুনয় চট্টোপাধ্যায়

১২. কবি সুকান্ত — অশোক ভট্টাচার্য

১৩. সংস্কৃতির কথা — মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল

১৪. কমিউনিজম কাহাকে বলে — ঐ

১৫. Art and social life — G. V, Plekhanov.

১৬. সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনা সংগ্রহ — দিলীপ মজুমদার—সম্পাদিত,

১৭. শরৎচন্দ্র — ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

১৮. মার্কসীয় অর্থনীতি — রঞ্জন চৌধুরী

১৯. কাব্য পরিক্রমা — অজিত কুমার চক্রবর্তী

২০. কাব্য জিজ্ঞাসা — অতুল গুপ্ত

২১. বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা — গোপাল হালদার

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা সংখ্যা	লাইন	আছে	হবে
১	১৪	অগ্রতির	অগ্রগতির
৪	২১	বেদনাহীম	বেদনাহীন
৫	১৫	টাশ্যারি	টার্শ্যারি
৬/২৭	২৮/২৭	চিন্তণ	চিন্তন
১০/২৮	৭/১৭	আকর্ষন	আকর্ষণ
১২	১৭	দূর্গ	দুর্গ
১৫	২২	কাল মার্কস	কার্লমার্কস
১৭	১০	প্রকাশেচ্ছু	প্রকাশেচ্ছু
২০	২৩	মগ্নচৈতণ্যে	মগ্নচৈতন্যে
২১/১২২	১৬/১২	প্রস্ফুটিত	প্রস্ফুটিত
২২	১৬	আঙ্কলস্	আঙ্কল
২৪	৫	বেড়িয়ে	বেরিয়ে
২৮	৮	অণুসঙ্গে	অনুষঙ্গে
২৯	১০	মস্তিস্ক	মস্তিষ্ক
৩৪	১০	স্বচ্ছল	সচ্ছল
৩৫	৬	বাঙলী	বাংলা
৩৬	২	অন্ততঃ ১২শ বছর আগে	সম্ভবতঃ ১২'শ শতকে
৩৬	৯	মুণি	মুনি
৩৭	৭ ও ১৯ লাইনে	যথাক্রমে "বাঙালী" ও 'অনুবাদের' এর পর আছে কমা	হবে দাঁড়ি

পৃষ্ঠা সংখ্যা	লাইন	আছে	হবে
৩৯	১৬/১৯	রাজানুকুল্য	রাজানুকূল্য
		ধর্মানুকুল্য	ধর্মানুকূল্য
	২৮	অষ্টম থেকে দশম	অষ্টম থেকে দ্বাদশ
৪১	২২/২৩	কিন্তু	কিন্তু আছে
		কিন্তু আছে	আছে
৪৫	৫	অর্থাৎ	তফাৎ
৪৬	১০	করতেই---এর পরে বসবে	হয়
	১৭	বিশ্লেষন	বিশ্লেষণ
৪৭	২	আলোর	আলোয়
৬৭	২৬	বৈজন্তী	বৈজয়ন্তী
৪৮	৭	রবীন্দ্রনাম	রবীন্দ্রনাথ
	১০	বিতার্কিত	বিতার্কিক
৫৪	২৩	ভাব-স্তুতি-সুবলিভ	ভাব-দ্যুতি-সুবলয়িত
৫৬	৫/৬/২৬	গভর্নর	গভার্ণর
		ঘোষনা	ঘোষণা
		অনুকরনীয়	অনুকরণীয়
৬০	৫	বিবরন	বিবরণ
৫২	৫/১৫	কছতেন	করতেন
		বিবর্তমের	বিবর্তনের
		মণীষী	মনীষী
৬৬	১১	উত্তরন	উত্তরণ
৬৭	১১	স্বত্তরে নুতন	সত্তার নূতন
৬৮	১৯	করছেম	করছেন
৭০/	৩/৪/২৬	দন্ত স্ফুট/দন্তস্ফুট	দন্তস্ফূট
		প্রস্ফুটিত,	প্রস্ফুটিত
৭২	৬	রুশ	রূপ

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা সংখ্যা	লাইন	আছে	হবে
৭৩	৩/৬	আত্মপ্রকাশন	আত্মপ্রকাশ
		নেত্র	পাত্র
৭৪	৪	স্বাতন্ত্র	স্বাতন্ত্র্য
৭৫	২	সর্বত্রভাবে	সর্বতোভাবে
৭৬/৭৭	৯/১০/২৭/১	মমত্তবোধ/কাঁমড়	মমতাবোধ/কামড়
		কোন	কোণ
৭৫/১০৯	৯/১৭	ভাদুরী	ভাদুড়ি
৭৭	১	দুর্লভ	দুর্লভ
৭৮	৭	উদাহরন	উদাহরণ
৭৯	৭/৯	বিকল্প	বিকল্প
		পরিনতি	পরিণতি
৮২/৮৪	২১/১	বাস্তবতার	বাস্তবতার
		বাস্তববাদী	বাস্তববাদী
১১৬	১০	ব্যহত	ব্যাহত
১১৯	৯	শ্রেণীচ্যুত	শ্রেণীচ্যুত
১২৩	১০	বাহিরেটা	বাইরেটা
১২৪	২৭	ঝড়া	ঝরা
১৩২	১৮	বহণ	বহন